

কালের পুতুল



প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৬

নিউ এজ সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৫

জানুয়ারি, ১৯৫৯

প্রকাশক :

জে. এন. সিংহ বায়

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলকাতা-১

প্রচ্ছদপট :

যামিনী রায়

মুদ্রক :

রণজিৎকুমাব দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়াব সারকুলার বোড

কলকাতা-১৪

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা

কালের পুতুল

বুদ্ধদেব বসু

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

KALER PUTUL

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের অন্তর্গত অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রথম 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো, প্রধানত গ্রন্থসমালোচনারূপে। গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ করার পূর্বে তাদের আদ্যন্ত পরিমার্জনা করেছি; কোনো-কোনো অংশ বর্জিত, এবং অনেক নতুন অংশ সংযুক্ত হয়েছে।

'লেখার ইস্কুল' প্রবন্ধটি ও 'কালের পুতুলে'র প্রথম অংশ 'চতুরঙ্গে', 'কালের পুতুলে'র দ্বিতীয় অংশ 'অলকা'য় এবং ফাল্গুনী রায় সম্বন্ধে রচনাটি ঐ কবিরই 'বারোটি কবিতা'র ভূমিকারূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'অন্নদাশঙ্কর রায়' প্রবন্ধের 'পুনশ্চ' অংশটি এবং 'সুকুমার সরকার' এখানেই প্রথম প্রকাশ করলাম।

১৯৪৬ বু.ব.

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে পাঁচটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হ'লো: 'প্রমথ চৌধুরী', 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', 'অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল' ও '"কবিতা"র কুড়ি বছর।' প্রথম সংস্করণে 'কালের পুতুল' প্রবন্ধের তৃতীয় অংশটি এবার স্বতন্ত্রভাবে 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা' নামে যথাস্থানে বিন্যস্ত হ'লো। 'কবির জীবিকা' প্রবন্ধটিকে বর্জন করেছি।

গ্রন্থটির প্রুফ দেখার সময় আবিষ্কার করেছি (খবরটি অবশ্য আমার কাছে নতুন নয়) যে বারো বছর আগে যে-আমি ছিলাম এখন আর সে-আমি নেই। ফলত, প্রবন্ধগুলির বক্তব্য সুদ্ধ বদলে দিতে মাঝে-মাঝে লুব্ধ হয়েছি; কিন্তু তা থেকে বিরত হয়েছি এই ভেবে যে, বেঁচে থাকলে, হয়তো দশ বছর পরে আবার এমনি পরিবর্তনের স্পৃহা জাগবে। অতএব আমার সংস্কারকর্ম ভাষাগত পরিশোধন ছাড়িয়ে বেশি দূর অগ্রসর হয়নি, এবং ভাষাসংস্কারেও লক্ষ রেখেছি যাতে আমার তৎকালীন রচনারীতি অত্যধিক ব্যাহত না হয়। লজ্জিত হয়েছি নিজের অমনোযোগে, যখন

দেখেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে' পংক্তিটিতে 'কুয়াশা'র সঙ্গে 'কঠিনে'র ও পূর্বোক্ত 'কমরেডে'র সঙ্গে 'বাসরে'র অসংগতি আমি লক্ষই করিনি, কিংবা এই কথাটাই অনুল্লিখিত রেখেছি যে রোমান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোমান্টিক হ'তে পারেননি ব'লে সমর সেন যে-দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তারই নাম 'কয়েকটি কবিতা'। কিন্তু এই সব ত্রুটি সংশোধনের এখন আর সময় নেই; বইখানা প্রায় পূর্বের আকারেই পুনঃপ্রকাশ করা হ'লো এই ভরসায় যে পরবর্তী সমালোচকেরা, জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলার সময়, অন্তত তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি ঔৎসুক্যবশত যাঁরা এই বইখানা পড়বেন তাঁদের অনুরোধ জানাই আমার 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' এবং 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে 'সাহিত্যপত্র' ও 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', এই প্রবন্ধ ক-টি প'ড়ে নিতে।

'কালের পুতুলে'র প্রথম প্রকাশকালে এর জন্য প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত যামিনী রায়; নতুন সংস্করণেও, আমার সৌভাগ্যবশত, সেই চিত্র ব্যবহার করা সম্ভব হ'লো।

ডিসেম্বর, ১৯৫৮

বু. ব.

শিল্পী যামিনী রায়-কে

চিত্রকলার আলোচনায় আমার অধিকার নেই ;
তাই আপনার প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা
নিবেদন করলাম
এ-বই আপনাকে উৎসর্গ ক'রেই।

সূচিপত্র

লেখার ইস্কুল

আমার এক বন্ধু, যিনি স্বভাবতই বাঙ্নিপুণ, সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন, 'আসছে জন্মে যেন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক হ'য়ে জন্মাই। দেখতে একটু ভালো হবো, স্বামীর গাড়ি থাকবে, ঘুরে-ঘুরে বেড়াবো।' সুখী জীবনের আদর্শ হিশেবে এ-জীবন নগণ্য নয়, এ-কথা মানতে বাধ্য হলুম। তবে এ-আদর্শ নিতান্তই জড়বাদী, এ-আপত্তি অবশ্য উঠতে পারে। শরীরের আরাম ও স্বাধীনতার প্রাধান্য স্বীকার করি, কিন্তু শুধু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। আমি ভেবে দেখেছি, বন্ধ্যা ধনীপত্নীর দাবি যত বড়োই হোক, আদর্শ সুখী জীবন আজকের দিনে যিনি ভোগ করেন, তিনি জনপ্রিয় ইংরেজ লেখক। সত্যি, একজন আধুনিক কৃতী ইংরেজ লেখকের চাইতে সুখী লোক আমি তো ভাবতে পারি না। প্রতিভাবান হবার তাঁর দরকার নেই, ক্ষমতাশালী হ'লেই যথেষ্ট, বরং প্রতিভাবান হ'লেই জীবনের আরম্ভে দারিদ্র্য ও নির্যাতন সইতে হবে। সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত সচ্ছলতা, এমনকি অপরিমিত অর্থ, তাঁর অধিকারে আসেই, বেশি দিন বেঁচে থাকলে বিরল প্রতিভাবানেরও আসে। কেননা আজকের দিনে একজন কৃতী ইংরেজ লেখকের সমস্ত পৃথিবী ভ'রে বছরের যা কাটতি, কোনো ফরাশি, রুশ কি জর্মান লেখক তা কখনোই আশা করতে পারেন না, নিজেদের কথা ছেড়েই দিলুম। সুখী হবার প্রধান একটি শর্ত কাজ করা, এবং মনের মতো কাজ করা, আর এ-বিষয়ে তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান। তাঁর শ্রমই তাঁর আনন্দ, এক হিশেবে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ, এবং সে-পরিশ্রমের পুরস্কার ভালোভাবেই পাওয়া যায় ব'লে সেটা আরো বেশি সুখের হয়। পুরস্কার শুধু অর্থ নয়, যশও আছে, সে যশও উঁচুদরের, যার সঙ্গে ফিল্মস্টার কি রাজমন্ত্রীর দু-চারদিনের নামডাকের কোনো তুলনা হয় না। যশ অবিমিশ্র মঙ্গল নয়, তবু মানুষমাত্রেরই কাম্য। এ-ছাড়া, তিনি অতুলনীয়, অপরূপরকম স্বাধীন। এ-স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা কিনা, সে-দার্শনিক আলোচনার মধ্যে যাবার শক্তি কি প্রবৃত্তি কোনোটাই আমার নেই, তবে সাধারণ লোক সাধারণত স্বাধীনতা বলতে এ-রকম জিনিশই বোঝে। অর্থাৎ তাঁর কাজের কোনো বাঁধাবাঁধি সময় কি নিয়ম নেই, যেখানে এবং যখন খুশি তিনি কাজ করতে পারেন, ইচ্ছে হ'লেই (একটা যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে) ছুটি নিতে পারেন, কোনো উপরিওলার তাঁবেদারি করতে হয় না, যথেচ্ছ দেশভ্রমণে কোনো বাধা নেই, বন্ধুবান্ধব নিজেরই নির্বাচিত। তার উপর, তাঁর মস্ত সুবিধে এই যে যা-কিছু তিনি করেন, পড়েন, ভাবেন, দ্যাখেন, সুখের কি দুঃখের যা-কিছু ঘটে তাঁর জীবনে, সবই তাঁর কাজের

সহায়তা করে ; সবই, প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে, তাঁর রচনার উপাদান হয় কিংবা হ'তে পারে। শিল্পীর জীবনে কিছুই একেবারে ব্যর্থ হয় না। তিনি যখন অলস, তখনও তিনি সক্রিয় ; লেখার কারখানায় যে-যন্ত্র চোখে দেখা যায় না, অর্থাৎ লেখকের মনের জল্পনা-কল্পনা, সেটাই লেখার ভিত্তি ; যদি তিনি কোনো গর্হিত কাজ ক'রে থাকেন, বা গভীর দুঃখ পেয়ে থাকেন, মানুষ হিশেবে তা তাঁকে যতই বিব্রত করুক, তাঁর শিল্পীজীবনে তা কোনো কাজে লাগবে না তা জোর ক'রে বলা যায় না। এ-জীবন যদি চরম সুখী না হয়, তাহ'লে সুখী হওয়া কাকে বলে তা আমি জানি না।

আধুনিক ইংরেজ লেখক সম্বন্ধে আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হ'লো সম্প্রতি সমর্সট মম্-এর আত্মজীবনী প'ড়ে।* মম্ অসাধারণ প্রতিভাবান নন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃতী লেখক মাত্র ; তাই আমার এই প্রবন্ধের যা বক্তব্য তাতে তিনিই উদাহরণ হিশেবে ভালো হবেন। (মম্-এর মতে অবশ্য, genius আর talent একই বস্তু, তফাৎ শুধু মাত্রার, এবং শুধু talent-এর সাহায্যে জগতে এত ভালো বই লেখা হয়েছে যে তার অধিকারী হ'লে লজ্জিত হবার কিছু নেই।) অনুকূল সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রে কোনো-কোনো লেখক নিজের সাহিত্যে যুগান্তর আনেন ও বিশ্বসাহিত্যে প্রভাব ছড়ান, আমার বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁরা আলোচ্য নন। যাঁরা খানিকটা ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে নিজের জীবনটাও সুখে কাটান, পাঠকদেরও অল্পবিস্তর সুখী করেন, এ-ধরনের লেখকই সংখ্যায় বেশি, এবং এঁদের পরিশ্রমেই সাহিত্যের আয়তন বেড়ে ওঠে। এঁরা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন না, কিন্তু ঐতিহ্য বজায় রাখেন, সেইজন্যেই এঁরা মূল্যবান। মম্কে এই ধরনের লেখকের প্রতিনিধি হিশেবে নেয়া যায়। তিনি বিশুদ্ধ পেশাদার লেখক। অন্য লোক যে-কারণে উকিল বা ডাক্তার হয়, তিনি সেই কারণেই লেখক হয়েছিলেন। তবে উকিল বা ডাক্তার না-হ'য়ে তিনি যে লেখক হলেন, তার কারণ ছেলেবেলা থেকেই লেখার প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিলো তাঁর। বাল্যকাল ফরাশি দেশে কেটেছিলো ব'লে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষায় প্রথমটায় তাঁর কিছু অসুবিধে হয়েছিলো—তিনি স্বীকার করেছেন, সে-সময়ে কোনো বুদ্ধিমান শিক্ষকের সাহায্য পেলে তাঁর প্রচুর উপকার হ'তো। অন্যপক্ষে, ছেলেবেলায় বইয়ের দোকানে লুকিয়ে-লুকিয়ে (যেহেতু বই কেনার পয়সার অভাব) মোপাসাঁ পড়বার জন্যেই বোধহয় ছোটোগল্পের রূপকল্পে তিনি এমন ওস্তাদ—সত্যি বলতে, ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মোপাসাঁর গ্রহণযোগ্য অনুকরণ একমাত্র তিনিই করতে পেরেছেন। ইস্কুল পেরিয়ে মম্কে ডাক্তারি পড়া শুরু করতে হয়, কিন্তু ডাক্তার হবার অভিপ্রায় তাঁর কোনোকালেই ছিলো না, লিখতে শিখবেন ব'লে একমনে সাহিত্যের ও দর্শনের বই পড়তে

* The Summing Up.

লাগলেন। সে-সময়ে ইংরেজি গদ্যে পেটারের যুগ চলেছে; পেটারের দম-আটকানো পোশাকি আবহাওয়া তাঁর আসলে ভালো লাগতো না, কিন্তু চলতি ফ্যাশনের প্রভাব কাটাতে না-পেরে প্রথমে ঐ ভঙ্গির উপরেই মকশো করতে লাগলেন। পরে সুইফট আর ড্রাইডেন প'ড়ে তাঁর চৈতন্য হ'লো, এবং এককালে তিনি এমনও দুরাশা করেছিলেন যে একটিও বিশেষণ ব্যবহার না-ক'রে একখানা বই লিখবেন। ডাক্তারি পাশ ক'রে তিনি লণ্ডনের এক হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করেন, সে-সময়ে মানবচরিত্রের, বিশেষত দরিদ্রজীবনের, নানা দিক নিজের চোখে দেখবার তাঁর সুযোগ হয়। মম্-এর মতে সাহিত্যিকের পক্ষে হাসপাতালের মতো চমৎকার ইস্কুল আর হয় না, প্রত্যেক নবীন ঔপন্যাসিককে যদি হাসপাতালে বছরখানেক কাজ করানো যায়, তাহ'লে তাঁদের পক্ষে ভালো বই লেখা অনেকটা সুসাধ্য হ'তে পারে। সেই হাসপাতালের অভিজ্ঞতা নিয়ে মম্ লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস ছেড়ে তিনি যে নাটকে এলেন তা তাঁর আত্মজ্ঞানেরই ফলে। দেখলেন, কথোপকথন তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন, কিন্তু দু-লাইন কথকতাতেই ঘেমে ওঠেন। সুতরাং উপন্যাসের চাইতে নাটকেই সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। তিনি স্বীকার করেছেন, উপবাসী গ্যারেট-জীবনের প্রস্তাব, বড়ো-বড়ো দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, তাঁকে লুব্ধ করেনি; লিখে অর্থ উপার্জন তাঁকে করতেই হবে। নাটকে এলো সাফল্য। কিছুকাল পরে, ওয়েস্ট-এণ্ড-এর তিনটি থিয়েটারে যখন তাঁর তিনটি নাটক একসঙ্গে চলছে, তখন পথ চলতে-চলতে হঠাৎ একদিন সূর্যাস্ত চোখে প'ড়ে তিনি ভাবলেন, 'বাঁচা গেলো! সূর্যাস্তের বর্ণনা লেখার জন্য আর মাথা ঘামাতে হবে না। এখন নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়ে দেখতে পারি।'

কথকতার প্রতি এই বিরাগ সত্ত্বেও পরিণত বয়সে তিনি যে আবার গল্প-উপন্যাসের দিকে ফিরলেন, তার কারণ এক সময়ে তাঁর সন্দেহ হ'লো নাট্যজগতে তাঁর এই প্রতিপত্তি বেশি দিন টিঁকবে কিনা। শুধু তা-ই নয়, গদ্য-নাটকের আয়ু সম্বন্ধেই তিনি সন্দিহান হলেন। (সারা বইটিতে তিনি একটিমাত্র ভবিষ্যৎবাণী করেছেন—'the prose play is doomed'—এবং এ তো দেখাই যাচ্ছে যে আজকালকার ইংরেজি নাটকের ঝোঁক পদ্যের দিকে।) অতএব, অর্থোপার্জনের আবশ্যিক তাড়নায়, চল্লিশোত্তরে তিনি আবার কথকতার পেশা ধরলেন—এবং তাঁর বর্তমান পাঠকেরা জানেন যে তাঁর নাটকের চাইতে তাঁর গল্প-উপন্যাসই ভালো, বিশেষত ছোটোগল্প। স্বাভাবিক বিমুখতা কাটিয়ে উঠে যে-কঠোর চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি কথকতার শিল্প আয়ত্ত করেছেন তার বৃত্তান্ত তিনি বলেননি, কিন্তু তা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

জীবনের বিরুদ্ধে মম্-এর কোনো অভিযোগ নেই। কেনই বা থাকবে? মেফেয়ারে তাঁর নিজের বাড়ি, শারীরিক আরামের সমস্ত

উপকরণই তাঁর আয়ত্ত, পৃথিবীর কোনো দেশই দেখতে বাকি রাখেননি, এমন কোনো ইচ্ছা তাঁর হয়নি যা অর্থাভাবে অপূর্ণ রাখতে হয়েছে। আমরা জানি যে পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে, নিজের সম্বন্ধে শেষের কথাটি যারা বলতে পারে। ইংলণ্ডের মনীষীমহলে তাঁর লেখার বিশেষ আদর হয়নি, সেজন্যও তাঁর বিশেষ দুঃখ নেই; জনসাধারণের কাছে হাতে-হাতে যে নগদ-বিদায় পেয়েছেন তাতেই তিনি সুখী। এ-মনোভাবে যেমন আছে অভীপ্সার অভাব, তেমনি এতে বিনয় ও আত্মজ্ঞানেরও পরিচয় মেলে। ইংরেজ সমালোচকের হাতে তাঁর রচনা সম্বন্ধে 'competent' আখ্যাটিই বারে-বারে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে তিনি ঈষৎ ক্ষুব্ধ, কিন্তু ফরাশি দেশে তাঁর গল্প সম্মান পেয়েছে, আর তাছাড়া 'competent' হওয়াটাও কিছু তুচ্ছ কথা নয়। যশ সম্বন্ধে মম্-এর মোহ নেই, তার ক্ষণস্থায়িতা তিনি জানেন। তাঁর যৌবনে ছিলো মেরেডিথ আর হার্ডির রাজত্ব, কিন্তু আজ কি কেউ 'Diana of the Crossways' পড়ে? এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও জিগেস করা যায় যে ইস্কুল-কলেজের বাইরে ও সাহিত্যিকরা ছাড়া, চসর, শেক্সপিয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, সুইফট, স্টর্ন, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়টই বা পড়ে ক-জন? বিশেষ-কেউ পড়ে না।

পস্টারিটির তথাকথিত মহিমায় আস্থাবান নন ব'লে মম্ তাঁর স্বজাতির অবহেলায় (এ-পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে) বিশেষ বিচলিত নন। মনে-মনে তিনি হয়তো জানেনও যে ঔপন্যাসিক হিশেবে জয়স, লরেন্স আর উলফই এ-যুগের প্রধান, কিন্তু হতাশাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি, নিজের সাধ্যানুযায়ী যত বেশি সম্ভব ও যত ভালো সম্ভব লিখে গেছেন। যে-কোনো লেখকের বিষয়ে বিবেচনা করতে হ'লে তাঁর উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে পরিমাণের কথাও বলতে হয়; কেননা দৈবক্রমে দুটি একটি সদ্‌গ্রন্থ লিখে ফেলা যায়, কিন্তু একজন লেখকের উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচুর্যও যখন দেখা যায় তখনই তিনি বড়ো লেখক হিশেবে গ্রাহ্য। সৃষ্টির প্রেরণা যেখানে সত্য, অজস্রতা সেখানে অবশ্যম্ভাবী না হোক, অবিরল। এ-বিষয়ে আমাদের দেশে মাঝে-মাঝে একটা অদ্ভুত মত শোনা যায়। অনেকের মুখে শুনেছি—অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুনতে হয়েছে, কেননা গায়ে প'ড়ে যাঁরা উপদেশ দেন তাঁদের উৎসাহ অদম্য—বেশি লেখা খারাপ, তাতে লেখা খারাপ হয়। কিন্তু এমন ক-জন লেখকের নাম আমরা মনে আনতে পারি, যাঁদের রচনাবলি পরিমাণে প্রচুর নয়? শেলি তিরিশ আর কীটস তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে এত লেখার সময় কখন পেয়েছিলেন তা ভেবে অবাক হওয়া অন্যায় হয় না। পৃথিবীর প্রধান লেখকেরা অনেকেই অজস্র লিখেছেন; আর সেটাই তো স্বাভাবিক, কেননা সাধারণ নিয়ম হিশেবে বলা যায় যে রচনা পরিমাণে বেশি না-হ'লে সমসাময়িক সাহিত্যে

ও সমাজে তার প্রভাব ব্যাপক কিংবা গভীর হ'তে পারে না। কোনো-কোনো 'বাজে' লেখকও যে বেশি লেখেন তাতেও অবাক হবার কিছু নেই; লেখা যাঁর খারাপ, তিনি যতবারই একটি বই লিখবেন ততবারই খারাপ বই লিখবেন, এ তো সোজা কথা। বাংলা দেশেও, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে মধুসূদন কিছু কম লেখেননি—রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু না-ই বললাম। বেশি লেখা খারাপ, এই ধারণার তাহ'লে ভিত্তি কোথায়?

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে 'বাজে' বিশেষণটা কোটেশন-মার্কার মধ্যে দিয়েছি। তার কারণ আছে। আমরা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগে অভ্যস্ত; বিশেষ-কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভূত না-হ'লেই সে-বইকে আমরা মনে-মনে 'বাজে' আখ্যা দিয়ে থাকি। সেই সঙ্গে জনপ্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখাও আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও এটাও দেখি যে প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় লেখকেরই কাল-ক্রমে পাঠকসংখ্যা বেড়ে চলে। কিন্তু যে-জাতের লেখা স্বভাবতই জনপ্রিয়—যেমন চুটকি হাসির গল্প কি গোয়েন্দা-গল্প—তার প্রতি অবজ্ঞাই মনীষীমহলে সাধারণ মনোভাব। কিন্তু সে-অবজ্ঞা লেখকদের দিক থেকে না-এসে বরং তাঁদের দিক থেকে আসে যাঁরা শিক্ষিত, এবং শিক্ষা-অভিমানী, পাঠক। যিনি নিজে গল্প লেখেন তিনিই জানেন যে ভালো গোয়েন্দা-গল্পের গঠন ও প্লটের কারসাজি অবজ্ঞেয় তো নয়ই, বরং শ্রদ্ধা করবার, ঈর্ষা করবার জিনিশ; যিনি কখনো কোনো কথোপকথন লিখেছেন, তিনিই জানেন যে যে-সব কথা প'ড়ে কি শুনে খুব সাধারণ লোকেও হাসে তা লিখতে পারা রীতিমতো একটা শিল্পকলা। এডগার ওয়ালেস বা পি. জি. উডহাউস-এর রচনা ব্যক্তিগতভাবে আমার অসহ্য লাগে, কিন্তু এটাও মানতে হয় যে ওয়ালেসের মতো প্লট ফাঁদা কি উডহাউসের মতো কথোপকথন লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে। স্বীকার করবো, এঁদের রাশি-রাশি লেখার মধ্যে অধিকাংশই দুর্বল ও কষ্টকল্পিত। কিন্তু এঁরা রাশি-রাশি লিখেছেন ব'লেই যে বাজে লেখক তা নয়, বরং রাশি-রাশি লিখেছেন ব'লেই, শেষ পর্যন্ত, লেখকসমাজে এঁরা কষ্টেসৃষ্টে স্থান পেয়ে থাকেন। এঁরা যে জাত-লেখক সে-কথা ঠিক, তা না-হ'লে দু-একখানা বই লিখেই থেমে যেতেন: তবে গোয়েন্দা-গল্পে কি চুটকি হাসির গল্পে জীবনের যে-ছবি ধরা পড়ে তা অতি সংকীর্ণ, উপরন্তু বিকৃত, এই কারণেই এঁদের নিকৃষ্টতা স্বতঃসিদ্ধ। এঁরা যখন ভালো লেখেন তখন এঁদের কারিগরির তারিফ করতে হয়; খুঁত যেটা থাকে সেটা এই যে জীবন সম্বন্ধে এঁরা কোনো মন্তব্য করেন না, কিংবা যে-মন্তব্য করেন, সেটা অন্তঃসারশূন্য। পক্ষান্তরে এ-কথাও বলা চলে যে কোনো অধ্যাপকের বা নীলবক্ষবান যুবকের লেখা 'ইনটেলেকচুয়েল' উপন্যাসে বড়ো-বড়ো বুলিকেই জীবনদর্শন হিশেবে চালাবার চেষ্টা থাকে মাত্র, কারিগরি সেখানে অনুপস্থিত। অথচ এমন অনেকে আছেন যাঁরা সে-সব বইকে বাহবা দেবেন, কিন্তু 'জনপ্রিয়' গল্প সাঁড়াশি দিয়েও ছোঁবেন না। আসলে,

শিক্ষা ও চাতুর্য ছাড়া কোনো প্রকার সাহিত্যেরই লেখক হওয়া যায় না—অন্তত অসংখ্য পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করা ও বজায় রাখার কৌশলটা শিখতে হয়, কিন্তু 'The Fountain'-প্রণেতা চার্লস মর্গ্যান-এর (যে-দৃষ্টান্ত প্রথম মনে এলো সেটাই দিলুম) সে-রকম কোনো দায় নেই ; তিনি যত খুশি ক্লান্তিকর ও অপাঠ্য হ'তে পারেন, কেননা তিনি 'ইনটেলেকচুয়েল'।

'জনপ্রিয়' সাহিত্য সম্বন্ধে মম্ একটি মন্তব্য করেছেন, যা উদ্ধৃতিযোগ্য। আমরা যখন বলি যে অমুক বইটি এতই ভালো যে এ-যুগে এর আদর হবে না, হবে ভবিষ্যতে, এবং এ-মতের সমর্থনে দু-একটা বিখ্যাত নজির দেখাই, তখন আমরা ভুলে থাকি যে এমন কত হাজার বই লেখা হয়েছে, বর্তমান যাদের গ্রহণ করেনি, এবং ভবিষ্যৎ যাদের কবর দিয়েছে। বর্তমানে উপেক্ষিত হ'লেই ভবিষ্যতে সম্মানিত হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই গণতান্ত্রিক যুগে ছাপাখানার গর্ভ থেকে যত হাজার-হাজার বই প্রতি বছর বেরোচ্ছে, তার বেশির ভাগই লেখকের পণ্ডশ্রম ও কাগজ-কালির অপব্যয় মাত্র। লেখকমাত্রেই পাঠক চান ; এবং 'বাজে' লেখকমাত্রেরই পাঠক জোটে না। ইংরেজি ভাষায় রাশি-রাশি নভেল জলের বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো যুগে পাঠকসাধারণের কতগুলো নির্দিষ্ট (কি অনির্দিষ্ট) দাবি থাকে ; সে-দাবি মেটাতে অল্প লেখকই পারেন। যাঁরা পারেন, তাঁদের মধ্যে আবার (এটাই আশ্চর্য) অনেকেই সৎলেখক। আমরা সাধারণত বলি যে বড়ো লেখক ভবিষ্যতের জন্য লেখেন। কথাটা এ-হিশেবে সত্য যে বড়ো লেখকের দৃষ্টি এতদূরে প্রসারিত হয় যে তাঁর স্বকালের বহুযুগ পরেও তাঁর লেখা মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে না ; অনেক সময় তাঁর মধ্যে আমরা ভবিষ্যতের অগ্রদূতকে দেখতে পাই, অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল কাটলে ; চিরকালের পটভূমিকায় যখন আমরা তাঁকে দেখি তখনই তাঁর অগ্রগামিতা উপলব্ধি করা সম্ভব, তার আগে নয়। তবে এ-কথাও সত্য যে মহত্তম লেখকদেরও কোনো-কোনো অংশ পরবর্তী যুগে ঝ'রে পড়ে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে সুইফট-এর নিবন্ধাবলি, যার মধ্যে তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তার প্রচার আজকের দিনে বিশেষজ্ঞমহলেই আবদ্ধ। যে-সব বেনামি রচনা সে-সময়ে সমস্ত আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডকে মুখর ক'রে তুলেছিলো, যার কোনো-একটির লেখককে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছিলো, আজকের সাধারণ পাঠকের কাছে তা ঘোরতর নীরস ঠেকবে—কেননা সে-সব সমস্যা, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, আজকের সমস্যা নয়। বড়ো লেখকরা সকলেই একদিক থেকে যেমন চিরন্তন, তেমনি অন্য দিক থেকে সমকালীন, স্বীয় সময়ের আদর্শ অনুসারে আধুনিক, এমনকি—topical। সমকালীনতা লেখকদের একটা মস্ত গুণ। বর্তমান যুগকে, সমসাময়িক পাঠককে লক্ষ্য ক'রেই মহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম লেখকের

উদ্যম ; মহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম সব লেখকই পাঠকের, এবং অধিক পাঠকের, প্রত্যাশী। কেবল নিজের বন্ধুদের মধ্যে রচনার প্রচার আবদ্ধ থাক, সত্যি বলতে কোনো লেখকই এটা চান না। তবে আরম্ভে অনেক ভালো লেখকেরই এ-দুর্দশা ঘটেছে, বিশেষত, উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত প্রতিভার অবমাননার কয়েকটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। জনসাধারণ আর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদই এর কারণ। তবু হয়তো বলা যায় যে সম্ভাব্য সম্মান থেকে অকালমৃত্যুই এঁদের বঞ্চিত করেছে। কীটস যদি শুধু ওঅর্ডস্বার্থের সমান আয়ু পেতেন তাহ'লেই বিপুল যশ তাঁর ভোগ্য হ'তো। যে-সব লেখক মোটামুটি দীর্ঘজীবন পেয়েছেন, তাঁরা যৌবনে অবজ্ঞাত হ'লেও শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর প্রচুর প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন। ডি. এইচ. লরেন্স যদি মাত্র ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারতেন, তাহ'লে প্রচুর অর্থ বা অগাধ প্রতিপত্তি কোনোটারই তাঁর অভাব হ'তো না। পক্ষান্তরে বর্নার্ড শ বা ইএটস চল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলে তাঁদের জীবন প্রায় কীটস-এর মতোই শোচনীয় হ'তো। লেখকের পক্ষে দীর্ঘজীবন নানা কারণেই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান চুলোয় যাক, ভবিষ্যতের জন্য আমি লিখি, এ-কথা, তাই, কোনো লেখকই বলতে পারেন না, শ্রেষ্ঠ লেখকও না। কেননা এ তো সহজ সত্য যে বর্তমান নিয়েই, এবং বর্তমানের জন্যই, তিনি লেখেন। সংকীর্ণ বন্ধুমহলে যে-খ্যাতির শুরু, যদি তাঁর যথার্থ মূল্য থাকে, তবে একদিন, এবং তাঁর সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের মধ্যেই, তা সমস্ত দেশে ছড়াবে। তাঁর রচনার বিস্তার ও গভীরতা অনুসারে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলবে। অবশ্য সমকালীন বিচার মহাকালের কবলে বিপর্যস্ত হয়েছে এমন উদাহরণেরও অভাব নেই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে স্বয়ং মহাকাল স্থবির নন, অস্থির ; প্রতি পঞ্চাশ এমনকি পঁচিশ বছর পর-পরই, স্ট্রেচির ভাষায়, সাহিত্যিক শেয়ার-বাজারে সাংঘাতিক ওঠা-পড়া হয়। যেমন, ১৯২০ পর্যন্তও শেলি ও কীটসের যে-শেয়ার মহার্ঘ ছিলো, এলিয়টের প্রতিপত্তি আরম্ভ হবার পর থেকে তার দাম কেবলই কমছে ; আবার ড্রাইডেন, পোপ, এমনকি বায়রন, যাঁদের শেয়ার একেবারে তলায় এসে ঠেকেছিলো, তাঁরা এখন বেশ মোটা গোছের ডিভিডেণ্ড দিতে পারেন। আবার ১৯৭০-এ যে আর-একবার ওলোট-পালোট হবে না, সে-কথা জোর ক'রে কে বলবে ? সাহিত্যিক রুচি নানা কারণে বদলায় ; এবং অতীতের সেই-যুগের সাহিত্যই আমাদের ভালো লাগে, যে-যুগের সঙ্গে আমাদের মনের মিল বেশি। নিকটতম অতীত সর্বদাই ঈষৎ হাস্যকর। মহাকালের এই অব্যবস্থিতচিত্ততা লেখককে ভবিষ্যতের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করতে নিষেধ করে। কোনো-কোনো মহামান্য লেখক সচেতনভাবেই চেষ্টা

করেছেন বর্তমানকে জয় করতে : এর উদাহরণ শেক্সপীয়র স্বয়ং, উদাহরণ ডিকেন্স। খদ্দের ধরবার ও রাখবার জন্য এমন-কিছু নেই যা না করেছেন তাঁরা। ভাঁড়ামি, রক্তারক্তি, হৈ-হল্লা, যা-কিছু এলিজাবেথীয় দর্শকের প্রিয়, শেক্সপীয়র কোনোটাতেই কার্পণ্য করেননি; ডিকেন্স উপন্যাসের কিস্তি বাজারে ছেড়ে উদ্বিগ্নভাবে কাটতি লক্ষ্য করতেন, কোনো-একবার বিক্রি কম হ'লেই পরের সংখ্যায় কিছু-একটা কারসাজি করতেন কাটতি বাড়াবার জন্যে; সে-উদ্দেশ্যে গল্পের প্লট বদলাতে কি চরিত্রের চেহারা ফেরাতেও তাঁর আপত্তি ছিলো না। খদ্দের খুশি করবার এই ব্যবসাদারি ইচ্ছে থেকেই লেডি ম্যাকবেথের, ফলস্টাফ-এর, পিকউইক-এর জন্ম। ড্রাইডেন ইংলণ্ডের প্রথম পেশাদার লেখক, যিনি প্রধানত নাট্যকার নন, এবং এলিজাবেথীয় লেখকদের তুলনায় ঢের বেশি আত্মসচেতনও বটে। যে-সব ঘটনা সে-যুগের তুমুল খবর, সেগুলোই তাঁর রচনার বিষয়, এবং তাড়াহুড়ো ক'রে লেখা শেষ ক'রে ঠিক সময়টি বুঝে তিনি গরম-গরম বাজারে ছেড়েছেন, যাতে সকলেই কেনে ও পড়ে। ড্রাইডেনের যে-সব ব্যঙ্গকবিতা আজও আদরণীয়, সেগুলোকে উঁচুদরের সাংবাদিকতা বললে একটুও ভুল হয় না। বর্তমানই লেখকের উপজীব্য; ভবিষ্যতে যদি কোনো আলো তিনি ফেলতে পাবেন, সে আলো পড়বে বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিহত হ'য়েই; নিজের কালকে তিনি যদি ভালোরকম বুঝে থাকেন তাহ'লেই তাঁর লেখায় হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ধরা পড়বে। শেষ বিচারে মানতেই হবে যে লেখকের ধর্মই সমকালীনতা।

এ-কথাও সত্য যে ভিক্টরীয় যুগের অবসানের পর থেকে এমন বই লেখা ক্রমশই দুরূহ হ'য়ে উঠেছে যা একই সঙ্গে ভালো ও জনপ্রিয়। ভালো লেখকেরও যথেষ্ট খদ্দের জুটবে, এই ধারণা ক্রমশই ম্লান হ'য়ে আসছে আমাদের মনে। বর্তমান যুগের শিল্পী জমিদার বা ধর্মযাজকের বৃত্তির উপর আর নির্ভরশীল নন, লেখককে পেশাদার হ'তেই হবে। এমনকি বাঙালি লেখককেও। যে-কথা আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার নানা জায়গায় বলেছি, মম্-এর বইতে ঠিক সে-কথাটি পেয়ে ভারি ভালো লাগলো। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, 'Writing is a whole-time job'। লেখকের জীবনের প্রধান কাজই লেখা, তাই তিনি পেশাদার। যদি ভাগ্যক্রমে তাঁর অন্য কোনো আয়ের রাস্তা থাকে যাতে লেখা থেকে বিশেষ উপার্জন না-হ'লেও তাঁর চ'লে যায়, তাহ'লেও তিনি পেশাদার লেখক। সুইফট বা ওঅর্ডস্বর্থ তাঁদের রচনাদ্বারা অল্পই উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে ডিকেন্স বা বালজাকের চাইতে পেশাদার তাঁদের কম বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এই অর্থে আমাদের বঙ্কিম ও মধুসূদনও পেশাদার। রবীন্দ্রনাথ তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু একজন যদি লেখাকেই জীবনের প্রধান কর্ম হিশেবে গ্রহণ করেন

তাহ'লে এটাই কি ন্যায্য নয় যে সেই কাজই তাঁর জীবিকার পন্থা হবে? এ-বিষয়ে আমাদের দেশে দেখি অনেকেরই উল্টো ধারণা। অনেকেই মনে করেন যে বই লেখা বা ছবি আঁকা এক 'পবিত্র' ব্যাপার, তা দিয়ে অর্থোপার্জন করা মানে তাকে কলুষিত করা। এ-কথা শুনে মর্মাহত হই, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এতে অবাক হবার বিশেষ-কিছু নেই; কেননা সাহিত্য বা শিল্পকলা ধনীর অবসরের বিলাসমাত্র, এই ধারণা সেদিন পর্যন্তও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিলো, ইদানীং হয়তো কেটে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও এ-কথা বলা গর্বের বিষয় ছিলো যে লেখা আমার পেশা নয়, নেশা। কিন্তু নেশার অসুবিধে এই যে তখনকার মতো যতই মধুর হোক, সেটা কেটে যায়; পেশা স্থায়ী ও পরিণতিপ্রবণ। আঠারো বছরের অনেক ছেলেকেই কবিতার নেশায় ধরে, কিন্তু তিরিশের ফাঁড়া কাটলে তবে বোঝা যায় কে কবি আর কে নয়। বাংলা ভাষায় অনেক লেখাই আমরা দেখতে পাই যা তারুণ্যের বুদ্‌বুদ মাত্র। যিনি সেই রঙিন ফানুষ আকাশে ওড়ালেন তিনি যদি লেখাকেই পেশা ক'রে নিয়ে অবিরাম পরিশ্রম করেন, তাহ'লে একদিন হয়তো সত্যই লেখক আখ্যার উপযুক্ত হ'তে পারেন তিনি, নচেৎ নয়। জীবিকার জন্য অন্য কাজ ক'রে, অবসর সময়ে লেখার প্রস্তাব গ্রাহ্য নয় এই কারণে যে লেখা একটা উঁচুদরের 'হবি' নয়, তা এক কঠোর কর্ম, যাতে সমস্ত সময়, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করতে হয়, রাজ্যশাসন বা বাণিজ্যবিস্তারের চাইতে তার প্রকৃতিগত গুরুত্ব একটুও কম নয়। যে-লেখা পড়তে অতি সহজ ও সুন্দর, তা ঝরঝর ক'রে ফাউন্টেনপেনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না, তা কত কঠিন শ্রমসাপেক্ষ তা শুধু সংলেখকরাই জানেন।

> ...A line will take us hours may be ;
> Yet if it does not seem a moment's thought,
> Our stitching and unstiching has been naught.
> Better go down upon your marrow-bones
> And scrub a kitchen pavement, or break stones
> Like an old pauper, in all kinds of weather ;
> For to articulate sweet sounds together
> Is to work harder than all these, and yet
> Be thought an idler by the noisy set
> Of bankers, schoolmasters, and clergymen
> The martyrs call the world.

ইএটস যাকে বলেছেন রোদে বৃষ্টিতে সারাদিন ধ'রে পাথর ভাঙার চেয়েও শক্ত কাজ, সে-কাজের পরেও জীবিকার জন্য অন্য কিছু করতে বলা উচিত নয়; তা যাঁরা বলেন তাঁরা এই কারণেই তা বলতে পারেন যে লেখার প্রতি তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন। এই মনোবৃত্তির ফলেই কেউ পরিমাণে বেশি লিখলে

আমরা আড়চোখে তাকাই, এবং 'পয়সার জন্য' যাঁরা লেখেন তাঁদের প্রতি সকরুণ অবজ্ঞা দেখিয়ে একটি সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি।

শেষ-উনিশ-শতকে চেলসী ছিল লণ্ডনের আর্টিস্ট পাড়া; সেখানকার এক খুদে পয়গম্বর একবার আকাশে নাক তুলে বলেছিলেন, 'পয়সার জন্য যে লেখে সে আমার জন্য লেখে না।' এ-কথার উত্তরে মম্ দুটি কথা বলেছেন; প্রথমত, লেখক বইখানা কেন লিখেছেন, এ-জিজ্ঞাসাই অবৈধ; কারখানার পেছনে উঁকি দেবার অধিকার সমালোচকের নেই, বইখানা কেমন হয়েছে তারই বিচার করবেন তিনি। ফলেই গাছের পরিচয়। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ স্থূল উদরের তাড়নাতেই লেখা হয়েছিলো; পক্ষান্তরে জগৎকে দিব্য আলোয় উদ্ভাসিত করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে-সব 'উচ্চাঙ্গ' গ্রন্থ মাঝে-মাঝে লেখা হয়, তার একটি বড়ো অংশ অপাঠ্য বাগাড়ম্বর। আর তাছাড়া, অমুক লোক 'পয়সার জন্য' লেখে এ-কথা বলার কোনো মানেই হয় না; কেননা যে-কোনো দেশেই এমন বহু পেশা আছে যা লেখার চাইতে ঢের বেশি লাভজনক, এবং যতখানি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকলে কৃতী লেখক হওয়া যায়, তা অন্য যে-কোনো পেশায় সফলতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং, উপার্জনই প্রধান উদ্দেশ্য হ'লে বহু অর্থকরী পেশা অবহেলা ক'রে কেউই লেখক হতেন না। যিনি লেখক, তাঁর কোথাও এমন একটা তাগিদ নিশ্চয়ই থাকে, যার ফলে তিনি না-লিখে পারেন না; ইচ্ছে করলেও লেখা বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্য-কোনো লাভের কারবারে মন দিতে তিনি অক্ষম। কোনো কাজ ক'রে তার পারিশ্রমিক অর্জন করা, আর অর্থের জন্যই কোনো কাজ করাতে তফাৎ আছে। বেশির ভাগ ডাক্তার ও উকিল, এবং সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা অর্থের জন্যই কাজে নামেন; অথচ এমন কথা কখনো কারো মুখে শোনা যায় না, 'ওঃ, অমুক লোকটা পয়সার জন্যে বীমাকোম্পানি ফেঁদেছে। ছি!' কিংবা, এ-কথাও কারো বলবার উপায় নেই, 'যে-লোক পয়সার জন্য ডাক্তারি করে, সে আমার জন্য ডাক্তারি করে না।' এতে শুধু এই বোঝা যায় যে ডাক্তার অথবা কোম্পানি-পরিচালককে আমরা যে-সামাজিক মূল্য দিয়ে থাকি, লেখককে তা দিই না, দিতে ইচ্ছুক নই। ছবি, কবিতা, গান, এ-সব জিনিশ অলস এবং বিলাসী লোকের খেয়াল, সাধারণের এই কুসংস্কারে শিল্পীরা নিজেরাও যখন সায় দেন, তখনই তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার। এই প্রতিবাদের একটি চরম উদাহরণ ডক্টর জনসন দিয়ে গিয়েছিলেন: 'Only a blockhead will write except for money.'

আমার বক্তব্য এই যে আজকের দিনের বাঙালি লেখকের পেশাদার হওয়া প্রয়োজন। জানি, অনেকে বলবেন এ-সব কথা নেহাৎই অরণ্যে রোদন, কেননা আপাতত আমাদের দেশে শিক্ষা ও সমৃদ্ধির যা অবস্থা তাতে অসাধারণ

ভাগ্যবান না-হ'লে কোনো লেখকই যে শুধু লেখক হ'য়েই জীবনযাপন করতে পারবেন এমন আশা নেই বললেই হয়। কিন্তু যা হওয়া উচিত সেটা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না ব'লেই যে হওয়া অনুচিত তা তো নয়। যে-সব কারণে আমাদের লেখকরা আজও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হ'তে পারছেন না সেগুলোর উপর তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে কোনো হাত নেই; তবে তাঁরা যদি অন্তত অলস-বিলাসী ভাবটা ছেড়ে দিয়ে পেশাদারের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তাতেও অনেকটা লাভ হবে ব'লে মনে করি। আজকের দিনেও যে ভারতীয় লেখক অন্য কোনো 'জীবিকার' কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, এতে ভারতের সমগ্র সাহিত্যের কত যে ক্ষতি হচ্ছে তা অনুমান করাও শক্ত। বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে পারি; এখনকার প্রায় প্রত্যেক লেখকই শেষ পর্যন্ত ভগ্ন প্রতিশ্রুতির দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকছেন, কেননা লেখার দিকে তাঁরা সমস্ত সময়, অনেকে অধিকাংশ সময়ও নিয়োগ করতে পারছেন না। যেটুকু তাঁরা দিয়েছেন তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো, আরো বেশি দেননি ব'লে অভিযোগ আনবো না, কেননা এর বেশি, সত্যি বলতে, আমাদের প্রাপ্য নয়।

সুখের বিষয় এইটুকু যে সাম্প্রতিক বাঙালি লেখকদের মধ্যে পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্ত বিরল ব'লে আর মনে হয় না। তার মানে শুধু এই যে অনেকেই লেখাটাকেই তাঁদের প্রধান কাজ ব'লে মনে করছেন। এটা মনে করায় লাভ অনেক। তাতে লেখক সৎ ও পরিশ্রমী হন, এবং লেখা যথার্থই ভালো হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাছাড়া, আমাদের দেশে লেখাটাকে যদি সাধারণত একটা পেশা হিশেবেই ধরা হ'তো, তাহ'লে মস্ত একটা পরোক্ষ উপকারেরও সম্ভাবনা ছিলো। তাহ'লে অন্তত ঝুরি-ঝুরি অপটু, অক্ষম ও অপাঠ্য লেখা এ-দেশে ছাপার অক্ষরে বেরোতো না। তাহ'লে এমন সব ব্যক্তি সাহিত্যিক খ্যাতির আলেয়ার পিছনে ছুটতো না, যাদের সারা জীবনেও সাহিত্যিক হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহ'লে একটি লেখা ছাপাতে পাঠাবার আগে আমরা অন্তত ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে যত্নবান হতাম। প্রত্যেক পেশাতেই একটা শিক্ষানবিশির সময় থাকে, নেই শুধু বাংলা ভাষার লেখাতে। বিশেষ কতগুলো পরীক্ষায় পাশ না-করলে ডাক্তার কি উকিল কি এঞ্জিনিয়র হবার ছাড়পত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু যে-কোনো লোক যে-কোনো মুহূর্তে ব'লে বসতে পারে—আমি লেখক। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় লেখার একটা অসুবিধে আছে। চিত্রকলায় কি সংগীতে স্বাভাবিক ক্ষমতার অভাব যত নির্ভুল রকম স্পষ্ট, লেখায় সে-রকম নয় ব'লে যে-কোনো মূঢ় মনে করতে পারে যে তার অপ্রকৃতিস্থ প্রলাপ প্রতিভার পূর্বরাগ। তাছাড়া, চিত্রকলায় কি সংগীতের মূল কলাকৌশল যে কষ্ট ক'রে শিখতে হয়, এ-কথা মেনে নিতে কারো গৌরবের হানি হয় না, প্রতিভাবান চিত্রকরও আর্ট-স্কুলে হাত পাকিয়ে থাকলে লজ্জাবোধ করেন না, সংগীতের স্কুলেও সাংগীতিকের

উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লেখার কোনো ইস্কুল নেই। যে-লোক একখানা সাধারণ চিঠিও লিখতে পারে না, সেও মনে করতে পারে যে লেখক হবার যোগ্যতা তার আছে। যেহেতু আমি বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত, ইচ্ছে করলেই আমি লেখক হ'তে পারি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই লেখক হওয়া যায় না, লিখতে শিখতে হয়। যিনি লেখাকে পেশা হিশেবে নেবেন, তিনিই প্রাণপণে খেটে লিখতে শিখবেন, আর শৌখিন বাবুরা দু-চারদিন ক্রীড়া ক'রে স'রে পড়বেন—পেশা ও নেশায় এই তফাৎ। তার উপর, লেখাকে পেশা হিশেবে সাহস ক'রে তিনিই নেবেন, যিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে লেখক হবার উপাদান তাঁর মধ্যে আছে। এ-আত্মজ্ঞান পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে নিজের তুলনার ফলেই আসে, যদি থাকে নিজের মধ্যে বিনয় ও সততা। এ-ভাবে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অস্থায়ী অবাঞ্ছিতদের বহিষ্করণ সম্ভব হ'তে পারে। এখানে ব'লে রাখি যে সাহিত্যক্ষেত্রে অযোগ্য ব'লে প্রতিপন্ন হওয়াটা এমন-কিছু নিরাশার কথা নয়, জীবনে কৃতিত্বের আরো বহু ক্ষেত্র আছে, এবং অনেক যুবক যাঁরা কোনোদিন লেখক হবেন না, তাঁরা অকারণে কালি ও কাগজ খরচ না-ক'রে, অন্য কোনো দিকে উন্নতির চেষ্টা করলে তাতে সাহিত্য তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেই, তাঁদের নিজেদেরও উপকার হবে প্রচুর। অক্ষমতার কোনো ক্ষমা নেই। পঞ্চম শ্রেণীর লেখক হওয়ার চাইতে সচ্ছল অবস্থার মনোহারী দোকানদার হওয়া ভালো নয় কি? যে-লেখা কোনো শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রাহ্য হয় না, তার প্রণেতা না-হ'য়ে সংসারের পাঁচজনের মতো সাধারণ জীবনযাপনের দিকে মন দেবার চেষ্টা অনেক বেশি প্রশংসনীয়—এ-দুর্দিনে সেটাও সুসাধ্য নয়। আমি ঠিক কোন কাজের উপযুক্ত, জীবনের প্রথমেই এটা বুঝে নিয়ে সে-উদ্দেশ্যে সময় ও শক্তি যিনি নিয়োগ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান। বাংলাদেশে লেখকের জীবনকে লোভনীয় বলা যায় না; তবু যে বর্তমানে মেকি লেখকের সংখ্যা এমন ভয়াবহরকম বেড়ে চলেছে তাতে হয়তো আমাদের সাহিত্যপ্রীতিই সূচনা করে, কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা এটাই চাইবেন যে প্রত্যেক লেখক হবেন পেশাদার, অর্থাৎ এই কাজের মর্যাদাবিষয়ে সচেতন ও অধ্যবসায়ী। শিখতে যিনি ইচ্ছুক ও সক্ষম, তাঁর কাছ থেকেই আমরা কালক্রমে উৎকৃষ্ট লেখা আশা করতে পারি। যাকে জন্মগত ক্ষমতা বলি, সেটা আসলে শেখবার ক্ষমতা; প্রত্যেক লেখকই তরুণ বয়সে পূর্ববর্তীদের অনুকরণ ক'রে ক'রে নিজেকে গঠন ক'রে থাকেন। বিনা পরিশ্রমে কোনোরকম লেখাই ভূমিষ্ঠ হয় না—জন্মের প্রক্রিয়া সর্বত্রই একরকম—ইএটস-এর কবিতাও নয়, মম্-ছোটোগল্পও নয়। মেকি লেখকের লক্ষণই এই যে তিনি শ্রমবিমুখ।

আমি এক-এক সময় ভাবি, লেখার একটা ইস্কুল খুললে কেমন হয়। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, বিলেতে অনেক ইস্কুল আছে যারা পত্রযোগে গল্প

লিখতে শেখায়। তাদের শিক্ষার প্রণালী প্রত্যক্ষ জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু অনুমান করি যে বিলেতি সচিত্র মাসিকে যে-একধরনের ছক-কাটা, মাপসই গল্প ছাপানো হয়, সে-গল্প এদের সাহায্যে লিখতে শেখা অসম্ভব নয়। অন্তত ভাষাব্যবহারের দু-একটি বাঁধা-ধরা কৌশল, এবং নির্ভুল বানান ও ব্যাকরণ তো শেখা যায়। তবে এটাও সত্যি যে বেশির ভাগ লোক সংক্ষেপে কাজ সারতে চায় ব'লেই এ-সব ইস্কুলের খদ্দের জোটে; নয়তো পাবলিক লাইব্রেরি থেকে ধার ক'রে বই প'ড়ে-প'ড়েই যা শেখা যায়, এবং ঢের বেশি ভালো শেখা যায়—তার জন্যে কেউ মাস্টারমশাইকে পয়সা দেবে কেন? আমি ভেবে দেখেছি যে লিখতে শেখার একটিমাত্র উপায় আছে—পড়া। লেখাতে হাতে ধ'রে শেখাবার কিছুই নেই—ছবি আঁকায় আছে, গানে আছে। কথা ছাড়া লেখার আর-কোনো উপাদান নেই, এবং সব কথা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। কথাগুলো প্রায় সবই আমাদের অনেকের জানা, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বসানোতেই লেখকের বিশেষত্ব। লেখার ইস্কুল খুলে, দুঃখের বিষয়, সেটা শেখানো যায় না; কথার ওস্তাদ কারিগর যাঁরা, তাঁদের কাছেই সেটা শিখতে হয়, তাছাড়া অবশ্য প্রত্যেক লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির উপরে অনেকটা নির্ভর করে। এই কারণে লেখক নিজেই নিজের শিক্ষক; অন্যের কাছ থেকে তিনি প্রচুর শিখতে পারেন ও শিখে থাকেন, কিন্তু সেটা পরোক্ষভাবে, অনেক সময় নিজেরই অজান্তে; প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবে তিনি যখন পাঠ নিতে যান, সে-শিক্ষা মূল্যবান হবে না এমন বলি না, কিন্তু খুব দূরস্পর্শী হয়তো হবে না। ভাষার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি, ভঙ্গির মনোহারিত্ব, কথাগুলোয় সম্ভবমতো পালিশ চড়ানো—এগুলো ইস্কুলের ধরনেই শেখানো যেতে পারে; কিন্তু ভাষার মর্মস্থলে প্রবেশ করবার রাস্তা পৃথিবীর মহৎ লেখকদের গ্রন্থমালাই। সেখান থেকে লেখক শুধু যে ভাষার রহস্যই শেখেন তাও নয়, জীবনের রহস্যও শেখেন, জীবনের ঘটনাকে তিনি সব সময়েই সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্ধিত, শোধিত ও সংযত ক'রে নিতে পারেন। আর, শেষ পর্যন্ত, জীবনকে দেখতে শেখাই লেখকের প্রধান দায়িত্ব, এবং এটাও কোনো ইস্কুলে শেখানো যায় না। সমস্ত জীবনই লেখকের কাঁচা মাল; কিন্তু জীবন বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, সেই উত্তাল আবর্ত থেকে কোন সময়ে কতটুকু তিনি নেবেন, এবং কী-ভাবে সেটা ব্যবহার করবেন, তার জন্য নিজের রুচি ও বিচারবুদ্ধি, তাছাড়া স্বোপার্জিত শিক্ষার উপরেই, তাঁকে নির্ভর করতে হবে। ভাষা ও কলাকৌশলের উপর মোটামুটি দখল না-জন্মালে লেখক হওয়া যাবে না; কিন্তু জীবনকে কে কত ব্যাপক ও গভীরভাবে দেখতে পেরেছেন, এবং তার প্রকাশই বা কতটা সত্য হয়েছে, লেখকদের আপেক্ষিক মূল্যের এ-ই হয়তো মানদণ্ড।

১৯৩৮

প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য

প্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট দান তাঁর গদ্য। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও চৌধুরী মহাশয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বাংলা গদ্যের ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বয়োকনিষ্ঠ এমন-কোনো লেখক নেই যাঁর উপর তাঁর প্রভাব না পড়েছে, কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে চলতি ভাষা নতুন ছিলো না। সতেরো বছর বয়সে লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' ও তার পরে 'ছিন্নপত্রে', নাট্যাবলির কথোপকথনে, হাস্যকৌতুকের কোনো-কোনো রচনায় যে-চলতি বাংলা তিনি লিখেছেন আজকের দিনেও তা নবীন লেখকের আদর্শ হ'তে পারে না তা নয়। তবু, কোথায় যেন একটু দ্বিধা ছিলো। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধের বাহন ছিলো সাধুভাষা—ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তিনি সাধুভাষায় কমই লিখেছেন —এবং যেটুকু লিখেছেন তা ক্রমশই অসাধু হ'য়ে উঠছিলো, শুধু ক্রিয়াপদগুলির ইয়া-প্রত্যয়ে নির্ভর ক'রে অতি কষ্টে সাধুত্ব বজায় রেখে চলছিলো। 'চতুরঙ্গে'র কথোপকথন সুদ্ধ সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু এ-বইটিতে আগাগোড়া পাওয়া যাবে চলতি ভাষার নির্ভার স্বাচ্ছন্দ্য; এর আত্মীয়তা বঙ্কিমের সঙ্গে নয়, 'লিপিকা'র সঙ্গে। আর 'জীবনস্মৃতি'র সাধুভাষায় সরসতা ও চিন্তাশীলতা, কবিত্ব ও কৌতুকের যে-সমন্বয়সাধন তিনি করেছিলেন তা বাঙালি পাঠকের চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু। কোনো-কোনো কবিতায় যেমন মিল না-থাকলেও মিলের অভাব লক্ষিত হয় না, মিল আছে কি নেই তা ভেবে বের করতে হয়, তেমনি 'জীবনস্মৃতি' কি 'চতুরঙ্গ'ও যে চলতিভাষায় লেখা নয় তা পড়বার সময় হয়তো খেয়ালই হয় না, পরে লক্ষ্য ক'রে বুঝতে হয়। অথচ এ সাধুভাষাই বটে। এ থেকে বোঝা যায় যে চলতি ভাষায় লেখবার তাগিদ রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেই ছিলো, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে 'সবুজপত্রে'র পতাকা উড়িয়ে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব তাঁকে নির্ভয় করলে; অকুণ্ঠিত সাহসে তিনি যে চলতি ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করলেন এর পিছনে প্রমথ চৌধুরীর অবদান অনেকখানি। জন্ম নিলো 'ঘরে বাইরে', আর তার পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যরচনাই চলতিভাষায়। এই ভাষা, যা আমাদের প্রাণের ভাষা, যাতে নব-নব আভার বিচ্ছুরণ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, যার সম্ভাবনা এখনো অফুরন্ত মনে হয়, তাকে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এ তাঁর এক মহৎ

কীর্তি। 'সবুজপত্র'কে ঘিরে যে-নবীন ও নব্যপন্থী লেখকের দল গ'ড়ে উঠলো, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বিখ্যাত ; এদিকে চলতি ভাষা নিয়ে সে-সময়কার উচ্চকিত বাক্‌বিতণ্ডার কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কত্বে সে-বিতর্ক এ-কথাই প্রমাণ করেছিলো যে শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বড়ো ও কলরবে প্রবল হ'লেও বুদ্ধিতে খাটো। সে-বিতর্কের অবসান আজও হয়েছে বলা যায় না, কেননা মাথা গুনলে দেখা যাবে জীবিত বাঙালি লেখকদের মধ্যে বেশির ভাগই এখনো সাধুভাষা আঁকড়ে আছেন— তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধুভাষায় লেখা অপেক্ষাকৃত সোজা, বহুদিনের অভ্যাসে তার একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে, লিখতে গেলে মাথা ঘামাতে হয় না ; কিন্তু চলতি ভাষা প'ড়ে-পাওয়া জিনিশ নয়, লিখতে-লিখতে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয় তাকে। তবু এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই যে সাধুভাষার এখন মরণদশা, তার যা হবার হ'য়ে গেছে, তাতে নতুন আর-কিছু হবে না, এবং বাংলা সাহিত্যে এমন দিন আসবেই যখন চলতিভাষা ছাড়া আর-কিছু থাকবে না।

চলতিভাষার প্রতিষ্ঠা প্রমথ চৌধুরীর মহৎ কীর্তি হ'লেও একমাত্র, এমনকি প্রধান কীর্তিও নয়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে গদ্যে তিনি অনিন্দ্য শিল্পী। ভালো স্টাইলের অধিকারী না-হ'য়েও ভালো গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিক হওয়া যায়—যদিও প্রাবন্ধিক হয়তো হওয়া যায় না, যদি না আমরা প্রবন্ধ বলতে শুধু তথ্যবহ রচনা বুঝি। গল্প তার ঘটনাপ্রবাহের বেগে ব'য়ে চলে ; রচনার শৈথিল্য, ভাষার জড়তা, গল্পের নেশায় পাঠক সবই ক্ষমা করতে প্রস্তুত। এই কারণে গল্পলেখকের ভাষাবিন্যাসের দিকটা আমরা সাধারণত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখি না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে অনেক নামজাদা লেখকের রচনাতেও ভাষার নানারকম দুর্বলতা ধরা পড়ে। আগোছালো, এলোমেলো রচনার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরীর উজ্জ্বল বিদ্রোহ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে রইলো। তিনি সেই দুর্লভ লেখকদের একজন, যিনি সত্যিই একটি স্টাইলের অধিকারী। ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, অকারণ বিশেষণপ্রয়োগ অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি যে-সব দুর্লক্ষণ বাংলা গদ্যের অভিশাপ, তিনি তাঁর রচনায় সেগুলিকে উচ্ছেদ করেছেন ; তাঁর গল্পে ও প্রবন্ধে আমরা বাংলা ভাষার যে একটি পরিমিত, সুসভ্য ও সহাস্য চেহারা দেখতে পাই, তার প্রভাব আজকের দিনের লেখকদের উপরে যে আরো বেশি ক'রে পড়েনি সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আধুনিক যুগের গাল্পিকদের মধ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য অন্নদাশঙ্কর রায় ছাড়া আর-কাউকেই বোধহয় বলা যায় না। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয় ; এর কারণ সারা দেশের মনে শরৎচন্দ্রের গল্পধারার অদম্য সম্মোহন। শৈলজানন্দ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত অধিকাংশ আধুনিক

ঔপন্যাসিকের রচনাতে শরৎচন্দ্রের গভীর প্রভাব কোনো-না-কোনো দিক থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আরো ব্যাপক হ'লে বাংলা গদ্যের অন্য একটি ধারা আমরা এতদিনে দেখতে পেতাম।

যদিও বসুমতী-সংস্করণ বেরিয়েছে, তবু আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে ন্যূনতম। আর তাঁর মতো অভিজাত লেখকের পক্ষে এই বোধহয় যথাযোগ্য সম্মান। এতদিনে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন ক'রে আমরা নিজেরা সম্মানিত হলুম। তাঁর রচনাবলিকে বসুমতী-সংস্করণের গ্লানি থেকে উদ্ধার ক'রে সুন্দর শোভন আকারে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ-কর্তব্য আংশিকরূপে সম্পাদিত হ'লো বিশ্বভারতী-কর্তৃক তাঁর গল্পসংগ্রহের প্রকাশে, আশা করি তাঁর প্রবন্ধাবলি ও কবিতাগুচ্ছ অনুরূপ আকারে প্রকাশিত হ'তে দেরি হবে না। আর তাঁর অভিনন্দন ধ্বনিত হোক বাঙালি লেখকসম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে, কারণ তিনি লেখকদের লেখক; এই দুর্ভাগা দেশের মূঢ় সমাজে আজও তিনি অপুরস্কৃত, কিন্তু যত দিন যাবে, ততই ফুটবে তাঁর রচনার দীপ্তি, ভবিষ্যতের বাঙালি লেখকদের তিনি হবেন অন্যতম প্রধান শিক্ষক। খাবার ঘরে তাঁর ডাক পড়বে দেরিতে, কিন্তু ঘরটিতে থাকবে উজ্জ্বল আলো, আর সঙ্গীরা হবেন সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সুনির্বাচিত। ভ্রমণের শেষে হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের সঙ্গে তিনি আহারে বসবেন।

১৯৪১

প্রমথ চৌধুরী

জন্ম : ৭ অগস্ট ১৮৬৮ ; মৃত্যু : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন জাতে রাজকবি, কিন্তু জন্মেছিলেন অরাজক যুগে। বীরবল ছদ্মনাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, অতএব বর্তমান কালের বঙ্গভূমি তাঁর প্রকৃত রঙ্গভূমি নয়। বাল্যকালে তবু রাজস্মৃতিরঞ্জিত কৃষ্ণনগরে নবাবি আমলের সূর্যাস্তসোনার ছিটেফোঁটা ভোগ করেছিলেন, কিন্তু যৌবনে এবং পরবর্তী জীবনে, ইংরেজের হর্ম্যময় নগরীতে, গণতন্ত্রের মন্ত্রমুগ্ধ বাংলাদেশে, এমন প্রায় কিছুই ছিলো না যা তাঁর সভাসদ্‌-স্বভাবের, তাঁর রাজন্য-রুচির অনুকূল। ভাগ্যক্রমে পৈতৃক বিত্তের স্বাধীনতা ছিলো ব'লে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর সাহিত্যবৃত্তির অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ; কিন্তু কালক্রমে ও কালচক্রান্তে সে-বিত্ত যখন ক্ষয়িত হ'লো, তখনও এই অসামান্য প্রতিভার প্রতি বাঙালি সমাজের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠেনি ; তাঁর গ্রন্থরাজি বিলুপ্তির প্রান্তে পৌঁছতে পেরেছে, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অধ্যাপকের পদপ্রার্থী হ'য়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিপরে তাঁর সংবর্ধনা নিরুৎসুক পাংশুতার উদাহরণরূপেই স্মরণীয়। আর অবশেষে, যেন তাঁর স্বভাবের সঙ্গে স্বকালের জীবনব্যাপী বিরোধের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ তাঁর মৃত্যুও হ'লো এমন এক সময়ে, যখন অরাজকতা দেশের মধ্যে অনর্গল, হত্যার সুলভতায় মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্যই মনে হয় না, আর যখন দেশের একজন মনীষীপ্রধানের তিরোধান সংবাদপত্রের কতিপয় ক্ষুদ্রাক্ষর পংক্তিতে আবদ্ধ থাকাটাই লোকচক্ষে সংগত ঠেকে। প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুতে সমস্ত বাংলাদেশ যে আজ নির্বিকার, যে-বাস্তবের বিবেচনায় এটা বিস্ময়কর নয়, সেই বাস্তবই আমাদের অধঃপাতের পরিমাপ। ঠিক এই সময়টায় বিভীষিকার প্রত্যক্ষতা না-থাকলেই বা এই মৃত্যু লক্ষ্য করতো ক-জন। যে-কারণে উন্মত্ততা আজ দেশের অধিনায়ক, সেই কারণেই প্রমথ চৌধুরী প্রায় আশি বছরের আয়ুষ্কালেও এ-দেশে বৃত হলেন না।

অথচ 'সবুজপত্রে'র সূচনা থেকেই সুসংস্কৃত বাঙালির চিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; তারপর সাহিত্যে কত দিক থেকে কত রকম হাওয়া দিলো, কিন্তু সে-প্রতিষ্ঠায় ভাঙন ধরলো না, বরং তা দিনে-দিনে সুদৃঢ় হ'লো। রবীন্দ্রনাথ বার-বার বরমাল্য দিয়েছেন, ঋণ স্বীকার করেছেন তাঁর কাছে, সে-ঋণের প্রকৃত স্বরূপ আজও আমরা চিন্তা ক'রে দেখিনি। 'সবুজপত্রে'র লেখকগোষ্ঠীর তিনি তো আরাধ্যই, উপরন্তু, পরবর্তী যুগের লেখকরাও, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রভাবের অন্তর্ভূত নন, তাঁরাও যৌবনে তাঁকে ভজনা

ক'রে উত্তরজীবনে তাঁর কীর্তিকথনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এ-কাজে 'সবুজপত্রে'র আত্মজদের চাইতে বরং একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাই যে অগ্রগামী, এটা নিশ্চয়ই তাঁর স্থায়িত্বেরই নিদর্শন। আমার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অনেকেই অবিচল প্রমথপ্রেমিক ; অন্তত একজন তাঁর সার্থক শিষ্য, এ-পর্যন্ত সার্থকতম। 'সবুজপত্রে'র উদ্দীপনার যুগ অতিক্রম ক'রেও যে তাঁর প্রভাবের ফসল ফলছে, এতে এ-কথা অন্তত বোঝা গেলো যে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের যুগ-বুদ্বুদ মাত্র নন, তাঁর আসন চিরকালীন।

সাহিত্যজগতে যে-অনুপাতে তাঁর প্রতিপত্তি, ঠিক সেই অনুপাতেই দেখা গেছে পাঠকসমাজে তাঁর বিষয়ে উদাসীনতা। বস্তুত, তাঁর সমীপবর্তী কোনো লেখকেরও তাঁর তুল্য অনাদর বাংলাদেশে আর কখনো ঘটেনি। বাংলাদেশ লেখককে ভালোবাসতে জানে না তা তো নয়, কিন্তু মনের মতো লেখক হওয়া চাই। বাংলা সাহিত্যে যে-অর্ধোত্তর শতাব্দী ধ'রে রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্য অব্যাহত ছিলো, সেই সময়ের মধ্যেই অন্তত তিনজন লেখক জনচিত্তে রাজত্বস্থাপন করতে পেরেছিলেন : শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলাম। এই ত্রয়ীর মধ্যে দু-জনই আবার কবি। শরৎচন্দ্রকে তাঁর খ্যাতির চরম লগ্নে সমস্ত দেশ যেমন ক'রে গ্রহণ করেছিলো, প্রমথ চৌধুরী তো দূরের কথা, আমি বিশ্বাস করি না আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্টে সে-রকম ঘটেছে। দেশ, সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথকে এখনও পায়নি : আমরা যে 'বিশ্বকবি' ইত্যাদি বালশোভন বিশেষণ তুশ্ছেদ্যভাবে তাঁর নামের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি, এবং পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণকে উপলক্ষ্য ক'রে বছরে আরো দু-বার সরস্বতী পুজার উত্তেজনা ভোগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি কিংবা লেখক নন, তা ছাড়াও অন্য কিছু ও অন্য অনেক-কিছু ; এবং একই কারণে তাঁর স্মৃতিরথের সারথির পদে এমন মহাশয়কেও মানায় যিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কিছুই পড়েননি, কিংবা 'কথা ও কাহিনী' মাত্র পড়েছেন, আর সে-কথা বেশ সগর্বেই ব'লে বেড়াতে যাঁর বাধে না। যে-রবীন্দ্রনাথ কবি, লেখক, সাহিত্যিক, তিনি খুব বেশি লোকের উৎসাহের বিষয় নন ; যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবংশে না-জন্মাতেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে যুক্ত না-হতেন, বিশ্বভারতী স্থাপন না-করতেন, জগদ্বিখ্যাত না-হতেন, এবং—এটাও কম কথা নয়—তাঁর কায়াকান্তি যদি দেবতুল্য না-হ'তো, তাহ'লে কি ধনপতিরাই তাঁর নামে প্রণাম করতেন, না কি গণমতের উন্মুখতাই তাঁকে পুতুলপুজোর ছুতো ক'রে তুলতো। বাংলাদেশে এমন মানুষ নিশ্চয়ই বিরল নয় যে দু-চারখানা বই পড়েছে অথচ রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, কিন্তু এমন-কোনো পাঠক যদি থাকেন (খুব সম্ভব তিনি পাঠিকা) যিনি জীবনে একখানা মাত্র বই পড়েছেন, ধ'রেই নেয়া যায় সেই বইয়ের লেখক শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের আর প্রমথ চৌধুরীর অভ্যুত্থান প্রায় একই সময়ে; সহযাত্রী তাঁরা, কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের এর চেয়েও উৎকৃষ্ট উদাহরণ যদি থাকে সেটি খুঁজে পাওয়া যাবে প্রামথিক জীবনচরিতেই। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জন দাশ, এই দুই নবীন ব্যারিস্টর একই দিনে প্রথম হাইকোর্টে পদার্পণ করলেন; চিত্তরঞ্জন সোজা উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে, আর প্রমথনাথ হোঁচট খেয়ে সেই যে ফিরলেন, জীবনে আর ও-মুখো হলেন না। লৌকিক অর্থে, চিত্তরঞ্জনের কৌসিলিকৃতিত্বের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসিদ্ধি নিশ্চয়ই তুলনীয়, এবং যাঁরা পুনর্মুদ্রণের পৌনঃপুনিকতা দিয়ে লেখকের মূল্যনির্ণয় করেন, তাঁরা কখনোই প্রমথ চৌধুরীকে আমলের মধ্যে আনেননি। বাংলা দেশ শরৎচন্দ্রকে দিলো হৃদয়ের উদ্বেল অভ্যর্থনা, আর প্রমথ চৌধুরীকে সম্ভ্রমের অভিবাদন; ঘন-ঘন শরৎ-সংবর্ধনার আয়োজন সাধিত হ'লো প্রমথ-পতিত্বে; লেখক-পাঠকের বিবাহে বার-বার তিনি পৌরোহিত্যে আহূত হ'তে লাগলেন, কিন্তু পুরোহিত নিজেই যে বরোত্তম এ-কথা কারো মনে এলো না। সেকালে আমাদের সাময়িক সাহিত্যে রবি-স্তবের চেয়েও চন্দ্র-বন্দনার মুখরতা ছিলো বেশি, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে নীরবতাই যেন নিয়ম; তাঁর শ্রেষ্ঠতা সাহিত্যিক সমাজে যেমন স্বতঃসিদ্ধ, অন্যত্র তাঁর অস্তিত্ব তেমনি অস্পষ্ট। এ-অবস্থা যে নিতান্তই অতীত তাও নয়: সেদিনও বেতার-বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান অধ্যাপকের মুখে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক লেখক-তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দর পর্যন্ত নাম শুনেছি, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর নাম পর্যন্ত শুনিনি। বস্তুত, বিদ্বজ্জনেরাও কদাচ তাঁকে সুনজরে দেখেছেন, কেননা অতি সহজে পাণ্ডিত্য বহন ক'রে পণ্ডিতের বৃত্তিটাকেই যেন তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, এবং আপন বৃত্তিনাশের আশঙ্কা কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। পণ্ডিতেরা তাই তাঁকে পারতপক্ষে স্বীকারই করেননি, যতক্ষণ না তাঁকে পেয়েছেন নিজের এলাকার মধ্যে, ছিদ্রসন্ধানের সম্ভাবনার সীমানায়। 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি' বা 'প্রাচীন হিন্দুস্থানে'র মতো রম্য রচনাকেও অতথ্যের অপবাদে অগ্রাহ্য করবার মতো নিন্দুকের অভাব হয়নি বাংলাদেশে, যদিও সে-সব তথ্যাতথ্য নিত্যই তর্কাধীন। দেখে-শুনে আমার ধারণা জন্মেছে যে আমাদের পণ্ডিতেরা লেখকের পিঠ-চাপড়াতে ভালোবাসেন: সেই লেখকই তাঁদের প্রিয়, লেখা যাঁর স্বভাব, কিন্তু লেখাপড়া অভ্যাস নয় ব'লে বিদ্বানের বশ্যতাস্বীকারে যাঁর আপত্তি হয় না।

আসলে বোধহয় সেই সব লেখকের বাঁশি শুনেই আমরা নাচি, যাঁরা আমাদের জীবিকার সমর্থক; অর্থাৎ আমাদের অবরুদ্ধ ইচ্ছাকে যাঁরা প্রকাশ করেন, আমাদের গুপ্ত দুর্বলতাকে গর্বের বিষয় ব'লে ঘোষণা করবার জাদুবিদ্যা যাঁদের জানা আছে। যেদিন থেকে 'সাধারণ পাঠক' ব'লে কথাটা উঠেছে, সেদিন থেকেই দেখা গেছে যে সাধারণ পাঠক পক্ষপাতী লেখকেরই পক্ষপাতী;

যাঁদের রচনায় নিজের মহিমান্বিত মূর্তি দেখে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভোলা যায়, জনগণের প্রাণপুত্তলি তাঁরাই। তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে চার-ইয়ারি বা নীল-লোহিতের রূপরশ্মির প্রতি দৃক্‌পাত না-ক'রে আমরা শিশুসেব্য 'দেবদাস' বা 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে মত্ত হবো কেন; কেন, তাহ'লে, হালখাতার হীরক-দ্যুতি আমাদের মনোগহনে বিকীর্ণ হ'তে পারলো না। প্রমথ চৌধুরী কখনো বিপ্লবের বন্দনা করেননি, কোনো-এক কল্পিত স্বর্গ-রাজ্যের ছবি এঁকে ক্ষুদ্রের অহমিকার খোরাক জোগাননি, ঈর্ষার বা প্রতি-হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ দেননি কখনো, সেইজন্য বাংলাদেশের মনের মতো লেখক তিনি হলেন না। মানুষ দুঃখী ব'লে তিনি যে মন-খারাপ করেছেন তাতে আমাদের মন মজলো না, যেহেতু মানুষ খারাপ ব'লে তিনি দুঃখ করেননি। আমরা পৃথিবীটাকে সুস্পষ্ট ভালো-মন্দে বিভক্ত দেখতে চাই; নিজেকে দেখতে চাই ভালোর সঙ্গে একাত্ম, আর যখন যাকে আমাদের শত্রু ব'লে ভাবি তাকে মন্দের প্রতিভূস্বরূপ; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর জগতে মানবস্বভাবের এই কৃত্রিম খণ্ডীকরণের স্থান নেই, সেখানে স্বপ্ন-নায়িকা উন্মাদিনী, মিথ্যাবাদীরা চিত্তহারী, বুদ্ধিজীবীরা বাক্যবীর মাত্র, এবং মল্ল, গীতজীবিনী আর বিদূষকই মহাকাব্যের কুশীলব। সে-জগতে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ, সনাতনী-অগ্রণী এ-রকম কোনো বিভেদ ধরা পড়ে না, যদি কোনো পক্ষপাত প্রকাশ পায় সে একমাত্র মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি, আর সেটা সত্যকার পক্ষপাতই নয়। এই নিরপেক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য, এবং সেটাই তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্তরায়। মন তাঁর ব্রাহ্মণের, ধর্ম তাঁর অনাসক্ত, কণ্ঠ তাঁর ধীরমধুর। জীবন ভ'রে বাক্‌বিতণ্ডার কর্ণধার হ'য়েও কখনো যে তাঁর গলা চড়েনি; রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বহু আন্দোলন যে অবিকল চৈতন্যে পার হ'য়ে যেতে পেরেছেন; জীবনে কোনো সময়েই যে রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতোও না—এর প্রত্যেকটিই তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিস্বরূপের অভিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনা আরম্ভ করেন বঙ্কিমের অকৃত্রিম অনুসরণে, আর শরৎচন্দ্র সবেগে রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন; এই অনুক্রমিক প্রবাহ থেকে স্বভাবের শাণিত স্বাতন্ত্র্যে একা প্রমথ চৌধুরী অবচ্ছিন্ন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বপুরুষ যদি কেউ থাকেন তিনি ভারতচন্দ্র; হয়তো কালীপ্রসন্ন সিংহ আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও হুতোমি সংস্কারস্পৃহা তাঁর ছিলো না, এবং সমগ্রভাবে ঈশ্বর গুপ্তকে সহ্য করা তাঁর মতো বররুচির পক্ষে সম্ভব ছিলো ব'লে ভাবা যায় না। যাত্রাকালে তাঁর লক্ষ্য ছিলো স্থির; সহজাত শক্তিকে শিক্ষিত ক'রে নিয়েছিলেন; তার উপর ভাগ্যক্রমে ফরাশি গদ্যের আদর্শ জাগ্রত ছিলো তাঁর মনে। তাই তো স্বভাব-রোমান্টিক ইংরেজের প্রভাব তাঁকে চঞ্চল করলো না, রবীন্দ্র-মদিরা পরিপূর্ণ পান ক'রেও আত্মহারা

হ'লেন না ; নিষ্কম্প্রভাবে উত্তীর্ণ হ'লেন শ্বেত, শীতল ও উজ্জ্বল মনীষিতায়। অনুকূল, অথচ অনুরূপ নন, একেবারে ভিন্ন, তবু ভক্ত ; অবিচ্ছেদ্য বন্ধু, কিন্তু বিশ্ববীক্ষায় বিপরীত ; এমন মানুষ রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁকেই দেখেছিলেন ব'লে তাঁর প্রমথ-প্রীতির সীমা ছিলো না।

বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরীর মনোরাজ্য বাস্তব জগতে আজ স্মৃতিমাত্র। প্রচারক, সংবাদিক ও সাংবাদিক-কবির এই জগতে, যেখানে নীল রক্ত লাল হ'য়ে যায়, আর লাল রক্ত পথে-ঘাটে ঝ'রে পড়ে, নীল-লোহিতের লীলা সেখানে অনেক আগেই থেমে গেছে। তবু এ-কথা সত্য যে ইহলোক থেকে বিচ্যুত হ'য়েও মনোলোক তার সত্তা হারায় না ; সভাসদ্‌বৃত্তি লুপ্ত হ'লেও সভ্যতা বেঁচে থাকে, এবং আভিজাত্য বংশগত না-হ'য়েও জন্মগত হ'তে পারে। পৃথিবীতে অরাজকতাই যদি আজ স্বরাজ পায়, তবু এমন মানুষ কয়েকজন থাকবেনই, রাজ্যশ্রী যাঁদের অন্তরে ; আর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যদি প্রকাশ্যেই ঘৃণা, হত্যা, পিশুনতায় রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও পৃথিবীর সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি অসম্ভব, যাঁরা অন্ধকারে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রাখেন। সেই অবিচল চারিত্রে যে-সব লেখকের প্রতিষ্ঠা, যাঁরা পাঠকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির উর্ধ্বে, প্রমথ চৌধুরী সেই বরণীয়দের অন্যতম।

১৯৪৬

'কল্লোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ

কয়েক মাস আগে দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যথিত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা সেই সব লেখকদের প্রথম লীলাক্ষেত্র, যাঁরা, আমার মতো, প্রায় পনেরো বছর আগে অতি-আধুনিকতার শীলমোহরে চিহ্নিত হ'য়ে আজ প্রায় অনাধুনিক হ'তে চলেছেন। গল্পসর্বস্ব সিকি-মূল্যের মাসিকপত্র হিশেবে জীবন আরম্ভ ক'রে 'কল্লোল' যে ক্রমে-ক্রমে নতুন লেখকদের মুখপাত্র হ'য়ে উঠেছিলো তার পিছনে ছিলো গোকুলচন্দ্র নাগের প্রেরণা, যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। গোকুলচন্দ্রকে আমি কখনো দেখিনি, তবে তাঁর রচনা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর নানা বিষয়ে তাঁর গুণপনার কথা বন্ধুদের মুখে শুনেছি। 'কল্লোলে'র গল্পসাহিত্যে বার-বার বর্ণিত যক্ষ্মামুমূর্ষু তরুণ শিল্পী যে নিতান্ত অবাস্তব নয়, জীবনে সত্যই যে ও-রকম ঘটে, যেন তা-ই প্রমাণ করবার জন্য গোকুলচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্যু ঘটলো। অতি তরুণ বয়সে যখন যক্ষ্মারোগ তাঁকে গ্রাস করলো, আমরা ভাবলুম এবার বুঝি 'কল্লোলে'রও সংকট উপস্থিত, কিন্তু দীনেশরঞ্জন 'কল্লোল'কে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়, নানাভাবে পুর্ণ ক'রে তুলতে লাগলেন। তাঁর উৎসাহে নানা দিক থেকে নবীন আগন্তুক এসে জুটলো 'কল্লোলে'র আসরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরো কয়েকজন নবীন ও সেকালে অজ্ঞাত লেখকের সানন্দ সহকর্মিতা তিনি যে পেয়েছিলেন সে তাঁরই যোগ্যতার ফলে। 'কল্লোল'-সম্পাদনা ছাড়া আর-কোনো কাজ তিনি করতেন না, তাতেই দিয়েছিলেন তাঁর সময়, সম্বল ও উদ্যম, এবং 'কল্লোলে'র আয়ু ঠিক তখনই ফুরিয়ে এলো, যখন সদ্য-আগত দিশি সিনেমার আকর্ষণ তাঁর সময় ও মনোযোগ অনেকাংশে অধিকার ক'রে নিলে।

ক্রমে 'কল্লোলে'র আকার বাড়লো, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নতুন লেখকরা তার পৃষ্ঠায় একে-একে দেখা দিলেন, তার খ্যাতি ও অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। তখন আমরা যারা ও-পত্রিকায় লিখতুম আমরা সকলেই 'কল্লোলের দল' নামে পরিচিত ছিলুম, এবং আমাদের নিন্দুকরা যতই সংখ্যায় ও তেজে বর্ধিষ্ণু হ'তে লাগলো, আমাদের আনন্দও ততই যেন উচ্ছল হ'লো—, লোকে নিন্দে করলেও আনন্দ হয় এতই ছেলেমানুষ তখন ছিলাম আমরা। একটা সময়ে নিন্দার মাত্রা এতই চড়েছিলো যে সাহিত্যের কোনো-কোনো শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি বিচলিত হ'য়ে একটি সভার আয়োজন করেন, যাতে 'কল্লোল' ও 'কল্লোল'-বিরোধী উভয় দল একত্র হ'য়ে একটা

বোঝাপড়া'য় পৌঁছতে পারে। বোঝাপড়া হবার সম্ভাবনা ছিলো না, কিন্তু সভাটি ঐতিহাসিক, কারণ সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে আর তার নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বিচিত্র সম্মেলন দু-দিন ধ'রে অনুষ্ঠিত হয়, আর দু-দিনই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিষয়ে তাঁর নিজের কথা বলেন; তাঁর সেই শুভ্র উজ্জ্বল মূর্তি আর আশ্চর্য কথকতা এখনও চোখে ভাসে, কানে বাজে। তাঁর সে-সব কথাই অনতিপরে বিখ্যাত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের আকার নেয়। কিছুদিন পরে দেখা গেলো 'কল্লোল'-দলের ঐকান্তিকতা আর টিঁকছে না; শৈলজানন্দ আর প্রেমেন্দ্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসুর সঙ্গে আলাদা কাগজ বের করলেন 'কালি-কলম', এদিকে অজিত দত্তর আর আমার যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' দেখা দিলো ঢাকা থেকে। 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও তখন সদ্য-সমাগত বিষ্ণু দে, ওদিকে 'কালি-কলমে' জুটলেন মোহিতলাল, প্রবোধকুমার সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। নজরুল ইসলাম—তখন তাঁর সৃষ্টিবেলার মধ্যাহ্ন—তিনটি পত্রিকারই ঝুলি সমানে ভর্তি ক'রে চললেন। 'কল্লোল' তিন ভাগ হ'লো, কিন্তু 'কল্লোলে'র মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না। তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা অন্য পত্রিকা দুটির প্রলোভন সত্ত্বেও 'কল্লোলে'ই বেরিয়েছে।

'কালি-কলম' আর 'প্রগতি' দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু 'কল্লোলে'র স্রোত যে উচ্ছ্বসিত হ'য়েই সহসা শুকিয়ে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। 'কল্লোল' আর চলবে না, এ-খবর যেদিন শুনেছিলাম সেদিন মনে যে-আঘাত পেয়েছিলাম, তার রেশ এখন পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে-মনে বলেছিলাম, দীনেশরঞ্জন মস্ত ভুল করলেন; আজও সে-কথা মাঝে-মাঝে মনে হয়। যদি 'কল্লোল' আজ পর্যন্ত চ'লে আসতো এবং সাম্প্রতিক নবীন লেখকদেরও গ্রহণ করতো তাহ'লে সেটি হ'তো বাংলা দেশের একটি প্রধান—এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম—মাসিকপত্র, আর দীনেশরঞ্জনের নাম সম্পাদক হিশেবে হয়তো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরেই উল্লিখিত হ'তে পারতো। এ-কথা মনে না-ক'রে পারি না যে এ-গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে ক'রেই হারালেন—বাংলা সিনেমা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্ষতি করলো 'কল্লোলে'র অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিকরূপে দায়ী হ'য়ে। সত্যি বলতে, আজ পর্যন্তও আমি 'কল্লোলে'র অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ-ধরনের আর একটিও সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হ'লো না—মাঝখানে 'স্বদেশ' ও তার পরে 'পূর্বাশা' উঠেছিলো, দুটির একটিও চললো না। 'উত্তরা' এককালে লেখকদের পক্ষে লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন তার থেকেও অস্তিত্ব নেই। আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি,

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা শুধুই কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্টরকম গতানুগতিকভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।

'কল্লোল' উঠে যাবার পরে দীনেশরঞ্জন কলকাতা ত্যাগ করলেন, কয়েক বছর পরে ফিরে এসে পুরোপুরি যোগ দিলেন সিনেমার কাজে। এতগুলি বছরের মধ্যে, একই মহানগরীতে বাস ক'রে, তাঁর সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ দেখা পর্যন্ত হয়নি। এ নিয়ে মনে ক্ষোভ থেকে যেতো, যদি না গত বছর ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের একটি সভায় ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতো। এক যুগ পরে দেখা, আর 'কল্লোল'-যুগের পরে এই প্রথম। তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে শেষ দেখাও হবে এই।

দীনেশরঞ্জন মানুষটি ভারি সুশোভন ছিলেন। সুপুরুষ, আলাপে-ব্যবহার সুন্দর, নানা গুণে গুণী। তিনি লিখতেন, কিন্তু মুখ্যত লেখক ছিলেন না ব'লেই বোধহয় সম্পাদকের কাজে নিজেকে পূর্ণভাবে অর্পণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর আঁকা D. R. স্বাক্ষরিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি এখনও হয়তো অনেকের মনে আছে। তাছাড়া গানে ও অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা ছিলো। আর সর্বোপরি ছিলো বন্ধুতার প্রতিভা—তাঁর 'কল্লোল'-পরিচালনায় যাকে বলা যায় প্রধান মূলধন। সহজে বন্ধু হ'তে পারতেন, তাঁর সংসর্গে অন্যদের পক্ষেও পরস্পরের বন্ধু হওয়া সহজ হ'তো। তাঁর কথা মনে হ'লে এখনও আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে, যেদিন প্রথম কম্পিতবক্ষে 'কল্লোল' আপিশে ঢুকেছিলাম। ১০।২ পটুয়াটোলা লেনের সেই আড্ডার নেশা কখনো ভুলতে পারবো না আমি। সেখানে সকলেই আসতেন—নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার, হেমেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্রলাল, মণীশ ঘটক ('যুবনাশ্ব'), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ, নলিনী সরকার (গায়ক), জসীম উদ্দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আরো অনেকে। এমন উদার ও বিচিত্র আড্ডার স্বাদ আমার জীবনে সেই প্রথম। মাঝখানে কিছুদিন দীনেশরঞ্জন সাপ্তাহিক 'বিজলী'রও সম্পাদক ছিলেন, গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে বৌবাজারের তেতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি গোষ্ঠীসুখের লোভে। উপরে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা প্রায় সকলেই অবশ্য 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং অধিকাংশেরই খ্যাতির প্রথম সোপানও 'কল্লোল'। তাছাড়া আমাদের আড্ডায় যাঁদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম 'কল্লোলে' বেরোয়, এবং 'কল্লোলে'র সূত্রেই তাঁদের নাম বাইরে ছড়ায়—যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীণদের মধ্যে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল

মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা 'কল্লোলে' প্রায়ই বেরোতো—রাধারানী দেবীও নিয়মিত লিখতেন—এবং এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির জন্য 'কল্লোল'ই প্রধানত দায়ী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনুকম্পা থেকেও 'কল্লোল' বঞ্চিত হয়নি, তাঁর অন্য নানা রচনার মধ্যে 'বাঁশি যখন থামবে ঘরে' কবিতাটি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়। সে-সময়ে যামিনী রায় অল্পই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ছবি 'কল্লোলে' দেখেছি ব'লে মনে পড়ে। এ-কথা এখনকার অনেকেই বোধহয় জানেন না যে নজরুলের গজল-গানগুলি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়, আর 'কল্লোল'-আপিশের তক্তাপোশে ব'সে নজরুল যখন অক্লান্ত উল্লাসে সে-সব গান গাইতেন, তখনও তা সারা বাংলাদেশের মনোহরণ করেনি। বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে-ক'টি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল', এবং সে-হিশেবে 'সবুজপত্র' ও 'ভারতী'র সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোলে'র নামও স্মরণীয়।

১৯৪১

জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি

বিদ্যালয়ে ইংরেজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওঅর্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজবুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন কবি নন? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য অন্তত কখনো-কখনো সাড়া না তোলে এমন মন যখন সাধারণের মধ্যেও বিরল, তখন কবিনামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে, তাতে সন্দেহ কী। শেক্সপীয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীটস? যদি বলা হয় যে ওঅর্ডস্বার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপী সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে-কথা মানবো, কিন্তু সকল কবির কাছেই তো প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মতো তীব্র অন্য কোন কবিতে তা জানি না। যদি বলা হয়, ওঅর্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিলো তাঁর পক্ষে ধর্মের শামিল, সে-কথা অস্বীকার করবো না; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything?' এর বেশি ওঅর্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ওঅর্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, বা লিখলেও সফল হননি। সেইজন্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল আঁটা থাকলে ডক্টরেটডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওঅর্ডস্বার্থেরই দখলে, এই রকম একটি ধারণা যদি আমাদের মনে জন্মায়, এবং তার ফলে পরবর্তী যুগের যে-সব কবিতে প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুনরকমের অনুভূতি ধরা পড়ে তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হ'তে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষাই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওঅর্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই অধিকতর গ্রাহ্য হ'তে পারে।

আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিশেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার বেশির ভাগই তো সোজাসুজি ঋতু-সংক্রান্ত। তাছাড়া, তাঁর 'জীবনদেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে; তাঁর মধ্যযুগের কবিতাবলিতে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

এক হিশেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো-কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতিব কবি।

আমার মনে হয়, আমাদেব আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়: তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। অবশ্য এই বইয়ের কবিতাগুলি আমার পক্ষে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো ও সাত বছরের মধ্যে; সেই সময়ে এরা অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিলো, তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে বোধ করি। সে-বইখানা তখনও কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী'র মতো, 'ঝরা পালকে'ও সত্যেন্দ্র দত্তের প্রভাব ছিলো স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল লিখতে পেরেছিলেন—

উটপাখি তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। 'ঝরা পালকে' স্মরণীয় বিশেষ-কিছু হয়তো ছিলো না, কিন্তু তার কয়েকটি লাইন আজও দেখছি ভুলতে পারিনি:

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধুলির মতো গোলাপি, রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে—স্বপ্নে—কতদিন।

সত্যেন্দ্র দত্তীয় ঝংকার থেকে এ অনেক দূরে; অতি পুরোনো কল্পনা এখানে যেন একটি অপূর্ব রূপ পেয়েছে। তাব কারণ ছন্দের নবত্ব, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম; এ-ছবির রচনায় যে-কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দর মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়; পড়তে-পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলুম।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা রুদ্ধ হ'য়ে থাকলো না; অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেলো তার প্রকাশবৈচিত্র্য। সে-সময়ে জীবনানন্দ যে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন তা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম; এবং এখন সেগুলোই একত্র দেখতে পাচ্ছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। ভালো কবিতার কেমন একটি আদিম অপূর্বতা আছে: মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন; এইমাত্র এই মুহূর্তে এর জন্ম হ'লো, এবং চিরকালের মধ্যে এর মতো আর-কিছু হবে না। এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুবের অনন্যতা ও অখণ্ডতা; প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো, যে-রকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয়।

বছর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবাব প'ড়ে সেইরকমই ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে জীবনানন্দর কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। তাঁব কল্পনা নব-নব রূপেব সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে উন্মুখ। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের 'বাজারে' তাঁর খ্যাতির বোল ওঠেনি। আমাদেব সুধীসমাজও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ব'লে মনে হয না। আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানি না। কবিতা ছাড়া আর-কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে দেশে-বিদেশে আত্মরটনার আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, তাঁব প্রকৃত অনুবাগী পাঠকেব সংখ্যা এখনও যৎসামান্য। তবে এটাও দেখছি যে সাম্প্রতিক তরুণ কবিদেব উপব তাঁব প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

২

বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর তিনি গুণীসমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প'ড়ে প্রথমেই মনে হয় যে এই লেখকের আছে এমন একটি ভঙ্গি যা বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম ক্ষেত্রে), এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ করাও সহজ। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে বাচালতার বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনেব বিষয় হয়, তবে এ-কথা আমাদের

মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থে তা একটিও নেই। 'নির্জন স্বাক্ষর', '১৩৩৩', 'সহজ', 'কয়েকটি লাইন', এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টত পড়েনি। উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্যস্রোতে প্রচুর পান করেছেন তিনি, 'জীবন', 'প্রেম', এই দীর্ঘ কবিতা দুটিতে শেলি ও কীটস উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরং কীটসের প্রভাব বেশি, আর সেই সঙ্গে সুইনবর্ন ও প্রির‍্যাফেলাইটদের। আর সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ক্ষুদ্র উপাদান নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সংগীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণে তা ধরা দিতে চায় না।

> বলি আমি এই হৃদয়েরে
> সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে, মনে হয়, যেন এই কবিতাগুলি আঁকাবাঁকা জলের মতোই ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা, আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো আকাশে, অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সব-কিছুরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি।

> পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
> হৃদয়ে বেদনা জমে,—স্বপনের হাতে
> আমি তাই
> আমারে তুলিয়া দিতে চাই!...
> পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
> বেদনা পেত না তবে কেউ আর,...
> থাকিত না হৃদয়ের জরা,...
> সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!...

তরুণ ইএটসকে মনে পড়ে, আর এ-কথা অনেক কবিরই মনের কথা, সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে চান যে-সব কবি, তাঁদের প্রত্যেকেরই

'স্বপ্ন' একটি বিশেষ রূপকথার মূর্তি গ্রহণ করে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।

তার পর,—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে, পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা কড়কড়!
শসাফুল, দু' একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়্সা
লতায় পাতায়;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়,
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়, ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে! ('মাঠের গল্প')

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ;
অবসর আছে তার, অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে।

* * * *

এখানে নাহিক' কাজ, উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিক ভাবনা।
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রৌদ্র চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবাসে।
('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনীচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন।

ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে-জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের চোখ মুখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল,
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে। ('পরস্পর')

এই সব রচনায় আধো আলোর লীলা, আধো ঘুমের মোহ; এই আবছায়ায়, এই অলসতায় কবির মুক্তি।

জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় যে চিত্ররচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর। তাঁর এই বিশেষত্বই কীটস ও প্রির‍্যাফেলাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রয়োজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের। তাঁর যে-কবিতাটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি:

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ায়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে; ('মৃত্যুর আগে')

এই স্তবক দুটি বিশ্লেষণ করলে জীবনানন্দর সমস্ত কবিত্বলক্ষণ বোঝা যাবে। দৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধের বিচিত্র ভোজ ব'সে গেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও শেষ পংক্তির অপ্রকট সলজ্জ সহজ অনুপ্রাস লক্ষ্য করুন, গাঢ় রাত্তে জ্যোৎস্নার উঠোনে খড়ের চালের স্পষ্ট কালো ছায়ার সামনে চুপ ক'রে দাঁড়ান—অনুভব করুন ঘুমের ঘ্রাণ, ঝিঁঝিঁর গন্ধ, নরম জলের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, তরঙ্গের রূপ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস।

কোনো শব্দের উল্লেখ নেই—প্রকৃতি এখানে শান্ত, সান্ধ্য, স্বপ্নাচ্ছন্ন, শব্দহীন।

জীবনানন্দর এই ছবিগুলি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি। এ তো সত্যি কথা যে আমাদেব সমস্ত অনুভূতি শরীরের ভিতর দিয়েই মনে এসে পৌঁছয়, অথচ কবিতায় এই ইন্দ্রিয়স্বাদের অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না বা করতে পারেন না, উপরন্তু যদি কেউ করেন, সমালোচকেরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। কীটস যে 'sensuous' মাত্র, 'sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকেরা গলদ্ঘর্ম। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি সুইনবর্নের লাঞ্ছনা। আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনানন্দব চেতনা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ; তাঁব রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, উপদেশ নেই, তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি; তা নিছক কবিতা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

৩

পরিশেষে কলাকৌশলের দিক থেকে দু-একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। জীবনানন্দর কান অত্যন্ত সজাগ। ছন্দকে ইচ্ছেমতো বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন, যেখানে বাধা পেয়েছে, সেখানে বাধাটাই কবির অভিপ্রেত। একই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে, এই পুরোনো কথার একটি নতুন দৃষ্টান্ত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে—অধিকাংশ অসমমাত্রার, আইনত যাকে বলতে হবে 'বলাকা'র ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা 'বলাকা'র ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। 'বলাকা'র তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে; এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা; এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে; ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। কলাকৌশলের অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, মধ্য-মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি

পংক্তিতে বেজে উঠেছে ; সে যেন অপার্থিব ও পলাতক, স্বপ্নের সুড়ঙ্গে অলস ভাবনায় তার যাওয়া-আসা।

> বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন
> বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই, একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
> উড়ে যায় ; কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
> পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে। ('শকুন')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই। এই ধ্বনি উচ্চ নয়, তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর-কোনো আধুনিক বাঙালি কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নামশব্দ ব্যবহার করেন মিল্টনের মতো জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য নয়, প্রির‍্যাফেলাইটদের মতো ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুরাযুগের নাম যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধন করেছেন বম্বাই, বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক নামশব্দ দিয়ে।

> সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
> কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
> এই সব পাখি ছিল ;
> ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
> নেমেছিল তারা তারপর,—
> মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
>
> বাদামি—সোনালি—শাদা ফুটফুট ডানার ভিতরে
> রবারের বলের মতন ছোট বুকে
> তাদের জীবন ছিল,—
> যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
> তেমন অতল সত্য হ'য়ে! ('পাখিরা')

ইংরেজি শব্দগুলোকে বাংলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষণীয় যে জীবনানন্দর পয়ারে যুক্তবর্ণ কম। যুক্তবর্ণের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে ; কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে একটি পংক্তিও নেই যা এলিয়ে পড়েছে। বরং, যুক্তবর্ণের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।

এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম, কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে মনে করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল ; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি

অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে; আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে প্রবলভাবেই নাড়া দেয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (আশা করি তেমন লোকের সংখ্যা দিন-দিনই বাড়ছে), তাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।

১৯৩৬

জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না; তার উপর তিনি স্বভাবলাজুক ও মফস্বলবাসী; এই সব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে স'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে না, কেননা এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবিজীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনা ছিলো সত্যেন্দ্র দত্ত-নজরুল ইসলামের আমেজ-লাগা, কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হ'লো তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলুম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা যে-কবিকে পেলুম তিনি সুদূর, স্বপ্নাবিষ্ট, তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, যেখানে যাকে বাস্তব বলি তার আভাসমাত্র নেই, কিন্তু সত্য ব'লে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে। সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে যাকে মনে হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আচ্ছন্ন, স্বপ্নের আত্মচালনায় অত্যন্ত বেশি মসৃণ—কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিশ্বাস নেয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের মতোই এ-কবির জগৎ আমাদের আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি—একটি সুর, আর-কিছু না। তার বর্ণনা কেমন ক'রে করবো?

সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!

তাঁর কবিতা নিয়ে বসলেই তাঁর এই লাইনটি আমার মনে পড়ে। একটি সুর—জলের মতো, হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগছে। মন বাধ্য হয় কান পেতে শুনতে, নিজের অজান্তেই আমরা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করি। কবিত্ব কি এই সুর ছাড়া আর-কিছু?

জীবনানন্দর কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত তার প্রমাণ এই যে সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁর খ্যাতি যে-অনুপাতে কম, সে-অনুপাতে তাঁর অনুকারকের সংখ্যা আশ্চর্যরকম বেশি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিলো না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে-পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এই সব লক্ষণ 'বনলতা সেনে'ও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটি বই, এবং এগারোটি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু এটি আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। এই এগারোটি কবিতাই জীবনানন্দীয় প্রতিভায় দীপ্যমান। 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়, চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার' এই তিনটি কবিতা সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে—তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার জন্যই চেষ্টা করতে হয়। ছোট্ট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পিছনে দিগন্তব্যাপী অসীম জলরাশির যে-ইতিহাস তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটি অদ্ভুতরসে ভরপুর, বিস্ময়করকে চরমে টেনে নিলে কী দাঁড়ায় এটি তারই উদাহরণ। রুচিভেদে এ-কবিতা কারো-কারো হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এই নির্লজ্জ ও নির্জলা কবিত্বকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। এটি আমাদের সাহিত্যের একটি সম্পদ। তাঁর কবিত্বের বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করা কঠিন নয়। পাঠকের কাছে তাঁর একটিমাত্র দাবি : সেটি এই যে তিনি চোখ খোলা রাখবেন। কেননা জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হ'তে পারে। বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এমন ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই দেখা যায় না। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হ'তে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ একবার কোনো-এক পত্রিকায়

লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব।' কথাটা তখন থেকে আমার মনে গেঁথে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ-কথাটাকে, কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না। অবশ্য উপমা কথাটাকে এখানে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হয়—ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরোনো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ—এ সমস্তই কি মূলত উপমা নয়? এই অর্থ স্বীকার ক'রে নিলে বলা যায় যে উপমা পরীক্ষা করলেই একজন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। জীবনানন্দ যখন বলেন—

> বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন—

তখনই বুঝতে পারি তাঁর মন কী-ভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে-চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ—এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবো। আবার যখন পড়ি—

> এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
> মাথার ওপর মশারি নেই আমার,
> স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে—

তখন কবির নিছক কল্পনাশক্তি আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই মদির কল্পনা থেকে ফুটে ওঠে দৃঢ় রেখার উজ্জ্বল রঙের ছবির মিছিল—'নগ্ন নির্জন হাত' পুরো কবিতাটিই তা-ই। শুধু শেষ ক-টি লাইন উদ্ধৃত করি :

> পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
> রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত,
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

সমস্ত কবিতাটি একসঙ্গে না-পড়লে শেষ পংক্তিটির (কিংবা ছবিটির) আশ্চর্য আলোড়ন অনুভব করা যাবে না, কিন্তু 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে-বিবাহ ঘটেছে তার আনন্দে আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলিত হ'তে থাকে। 'নগ্ন নির্জন হাত' চিত্রটি যেন একটি still life, শুধু ঐ হাতখানা তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত ক'রে তুলেছে। আবার কখনো দেখি এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের আঘাত উৎসারিত :

> হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
> দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,

মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের
চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

পর-পর চারটি বিশেষণ—কিন্তু চারটিই সার্থক।

জীবনানন্দর সমগ্র রচনায় একটি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাতে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের, না কলাকৌশলের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা; পয়ার ছাড়া অন্য-কোনো ছন্দও এ-পর্যন্ত তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য গদ্য-কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন—এবং গদ্য-কবিতায় তাঁর কৃতিত্ব আমি অসামান্য ব'লে মনে করি। পয়ারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট—কিন্তু সেটা অনুভব করবার, বিশ্লেষণ করবার নয়। কেননা সে-বৈশিষ্ট্যের নির্ভর আঙ্গিক অভিনবত্ব নয়, তাঁর নির্জন বিষণ্ণ কবিপ্রাণেরই ক্ষরণ বলা যায় সেটাকে। আবার বলি, তিনি আমাদের নির্জনতম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে যে স্পর্শমাত্র করেনি, এটাকে নিন্দে ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মকেন্দ্রিক, প্রশংসা ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান। আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই-যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থানপতন পার হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্তপ্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।

১৯৪৩

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও

পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে,' 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতা'য়, আর কোনো-কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হ'লো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম, তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে-পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পংক্তি তারার মতো জলজল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার

যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশস্ত্র, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সম-সাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়. কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ

সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো ; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপুর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ ;··· তাঁর কবিতা একটু ধীর-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-স্বরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।···তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়।··· তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে' মনে হয় না।··· [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পুর্ব্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি—যথা, "ফেঁড়ে," "নটকান," "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে-কথা আগেই বলেছি ; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। * * *

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।···জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান ;—সে মায়াপুরী

হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।...[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জল-স্রোতের মত তোড় এর নেই;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী —থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর···বহু কবিতায়···পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।...দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি;—কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার···ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে' থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মত গুঞ্জন করে' ভেসে যায়।

('প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি ?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ ? কখনো নাম শুনিনি তো !

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা ! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'···আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে ; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি·· উভচর ভাষা অবলম্বন করে' আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে ? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি ?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ॥ তোমার, মতন কেউ। নাই আর॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি।…শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া।

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়বে। ছাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।…অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন:

> সেই জল-মেয়েদের স্তন
> ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে

বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা?…যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে…কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে ক'রে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?…আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐকাহিক চমক-লাগানো ব্যাপাব নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পংক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে-করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা

দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতায়, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনিনি, যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পংক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার

মধ্যে জীবনানন্দর পংক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে ; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি ; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত : যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধে'র সঙ্গী-কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী,/আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক',/পড়ি নাক' দুর্দশার গান/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান') ; আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায়, চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা') ; দ্বিতীয়ত,

আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়, চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পংক্তিগুলিতে,* কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া',

* তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি-কোটি শূয়োরের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় ঘৃণা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো :

'যেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর 'O curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায়, চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars' সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধ যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পংক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও সুরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ;/এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এর আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে ফের রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।...
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই...

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ

প্যাচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু' জনে মিলে শূন্য করে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর—সেই সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পংক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য: জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন;* আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পংক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের

* উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা ক'রে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাৎ আছে। 'হাঙরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা বইকি, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয়; আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ-কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রূপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো

থমথমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত: আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার'—এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও না, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা', 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পংক্তিটি আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে।

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়—আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
> হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
>
> প্রেম ছিল, আশা ছিল, তবু সে দেখিল
> কোন ভূত ?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো* : আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের

* অর্থাৎ, এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল ; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে, এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বাব জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

১৯৫৫

সমর সেন : কয়েকটি কবিতা

মানুষের জীবনে নবযৌবন স্বভাবতই বিদ্রোহের ঋতু। এত বড়ো দুর্ভাগা কোনো মানুষই বোধহয় নেই যার জীবনে ষোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও কোনো মহৎ প্রেরণা বা কল্পনা আসেনি। আমাদের দেশের পেন্সনপ্রাপ্ত বৈষয়িক বৃদ্ধদের দেখে অবশ্য এ-কথা মনে আনা শক্ত; কিন্তু খুব সম্ভব ঐ ইনভেস্টমেণ্ট-সর্বস্ব মহাশয়গণও বয়ঃসন্ধিকালে একবার কোনো ভাবের আগুনে জ্ব'লে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই যখন এই কথা, তখন কবিপ্রকৃতিতে নবযৌবন যে হবে বন্যার মতো, সেটা আশাই করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ক্ষণিক ও দুর্বল স্ফুলিঙ্গ এক ফুঁয়েই নিবে যায়, তারপর দেহের মেদ আর ব্যাঙ্কের খাতা একযোগে স্ফীত হ'য়ে উঠতে থাকে। নয়তো নানা সংগ্রামের আঘাতে হতভাগ্য জীবনসৈনিক কোথায় যে তলিয়ে যায় তার চিহ্নই থাকে না। আর কবির নবযৌবনের বিদ্রোহ ক্রমে থিমিয়ে দানা বাঁধে, হ'য়ে আসে গভীর ও গম্ভীর, হয়তো গ'ড়ে ওঠে শান্তি সকল বিরোধ ও বিক্ষোভ ছাপিয়ে, হয়তো দেখা দেয় কোনো নবনির্মাণের পরিকল্পনা। যে-কবির দীর্ঘকাল বাঁচার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর প্রথম ও শেষ বয়সের রচনা পাশাপাশি পড়লে এইটেই আমরা দেখতে পাই।

এই বিদ্রোহের ঝোঁক বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন পথ নেয়; কিন্তু মোটের উপর কতগুলো লক্ষণ প্রায় সমান থাকে। পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে, নিজের মধ্যে যত গ্লানি ও বিরোধ, তার বিরুদ্ধে; ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা—কবিকিশোরের প্রথম রচনায় গতি-প্রবাহ দেখা যায় এ-সব দিকেই। কিছু হয়তো থাকে আতিশয্য, কিছু ফেনা; কিন্তু প্রেরণা যেখানে সত্য, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকার ক'রে খুশি হই।

সমর সেনের কবিতায় এই বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। প্রথমে রীতির কথা বলি। তাঁর কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো পদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি গদ্যে ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এমন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য

কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি ; অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টায় অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে। 'কয়েকটি কবিতা'য় যে-রকম সচেতন ও তির্যক ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-কাব্য উদ্ধৃত করা আছে, তাতেই বোঝা যায় যে আমাদের যেমন প্রথম যৌবনে নিশ্বাসের বাতাসই ছিলো রবীন্দ্র-কাব্য, এ-কবির সে-রকম নয়। বাংলা কবিতার যে-ঐতিহ্যসম্পদ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, এই নবীন কবি সেখানে যেন কোনো অবলম্বন খুঁজে পাননি। আমি নিজেও সেই ঐতিহ্য থেকেই যাত্রা করেছিলুম, তাই তার লক্ষণসমূহ মোটামুটি বুঝতে পারি। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে-প্রেরণা আমাদের মনে সবচেয়ে প্রবল ছিলো, আজ যদি তার কোনো নাম দিতে হয় সেটাকে সৌন্দর্যানুভূতি বলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। এই অভিসম্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কেননা আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম তার মূলে এই কথাটাই ছিলো।

নিজের কথা উল্লেখ করতে হলো, পাঠক মার্জনা করবেন। যে-রকম বয়সে সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' লিখেছেন, সে-রকম বয়সেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম ; এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে-মনে তুলনা করতে ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে ; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে ; তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে 'কয়েকটি কবিতা' কালপ্রভাবে কিছু বেশি 'আধুনিক', এবং লেখকের স্বভাবের প্রভাবে কিছু বেশি সীমাবদ্ধ। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ ছিলো ব্যক্তিগত বা মানবিক, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের ; আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আত্মার কলুষ নয়, সামাজিক দুর্ব্যবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনে বণিক-শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ—এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হ'য়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন ক'রে ?

উর্বশী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে;
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি
কতো দীর্ঘশ্বাস,
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতো দিন।

উপরে যা বলেছি, হয়তো একটু কাঁচা শোনাতে পারে। আশা করি সমর সেনের বলবার কথা এ-রকম নয় যে মানবসমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থার অধীন ব'লে কবি তাঁর নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। মুষ্টিমেয় প্রতাপশালীর দ্বারা বৃহৎ সমাজের শোষণ পৃথিবীতে কিছু নতুন ঘটনা নয়; মধ্যযুগে তার রূপ হয়তো আরো ভয়াবহ ছিলো। কিন্তু প্রায় সকল যুগেই এমন কবির উদ্ভব হয়েছে, যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন; স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকেননি। তাহ'লেও এ-কথা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি; সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্তমাংসকে গ'ড়ে তোলে। যে-যুগে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কবির পক্ষে সেটা দুঃসময়। বর্তমান সময়ের সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে-তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি। তাঁকে দোষ দিইনে, বরং এ-কথাই বলি যে নতুনের সুস্পষ্ট আবির্ভাব যতদিন না হচ্ছে, ততদিন পুরোনোকে দীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটা শ্রদ্ধেয়, সেই ইচ্ছার দ্বারাই নূতনের পথ প্রস্তুত হয়।

২

বাংলাদেশে বিশ শতকের এই চতুর্থ দশকে যে-কবির যৌবনের উন্মেষ হ'লো, কতগুলো তথ্যের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সে দেখবে তার চারদিকে মধ্যবিত্ততার নিরেট দেয়াল; তার যৌবনের আবেগ যেদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে সেদিকেই ব্যাহত হবে। ভালো পাশ করবে, সম্ভব হ'লে আই.সি.এস.-এ ঢুকবে, নয়তো অন্ত কোনো বড়ো চাকরিতে আমলারাজ্যের উজ্জ্বল মণি হ'য়ে রায়বাহাদুরি গোধূলিতে জীবনের

অবসান করবে, তার পরিবারের ও সমাজের এ-ই তো উচ্চতম আদর্শ। তার পারিপার্শ্বিক একেবারে বেখাপ্পা, এমনকি প্রতিকূল, তার মনের আগ্নেয় উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। শহরে সে দেখবে বৈশ্য আদর্শের আধিপত্য; অর্থস্ফীতির কোনো উপায়াই অন্যায় নয়; প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ব্যস্ত, ছোটো-ছোটো গণ্ডিব দ্বারা রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ। আর দেখবে বড়ো-বড়ো নীতি-কথার আড়ালে অনাচার, অত্যাচাব, যৌবন-বাসনার বিকৃতি ও অবমাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি। কোনোখানে কোনো বড়ো আদর্শ নেই, নেই মানুষের দেহ-মনের সহজ স্ফূর্তি, সাবাটা জীবন যেন এক কঠিন নিষ্ঠুর নিয়মের ক্রীতদাস। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয়।

একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হলো
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস .
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

এই সামাজিক পবিবেশে কবির উন্মীলমান যৌবন পীড়িত হবেই, এবং সেই পীড়া থেকে তার কাব্য একেবারে মুক্ত হবে না। সমব সেনের কবিতায় এই অসুস্থতাবোধ খুব বড়ো একটা লক্ষণ। নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন, কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশিব ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড-খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগব-জীবন সমর সেনেব কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমব সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহবের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাৎরার মতো রাত্রি

*   *   *   *

আর কতো লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কতো গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!

যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চীৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে! ('নাগরিক')

এই কথাগুলিতে আছে শহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধ্বনি; আছে ব্যঙ্গ ও বিক্ষোভ, ; আছে নীরক্ত মানুষের ক্লান্তি ; আর আছে দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদের ইঙ্গিত—সেটাও অগ্রাহ্য নয়।

৩

সমর সেনের রচনায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে আমি দেখলুম, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। বাংলাদেশে আজ যেন যৌবনের বড়ো অভাব; পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যে-অনাসৃষ্টি—"practical young men"—তাদেরই সংখ্যা এদেশে আজকাল বেশি মনে হয়। জীবনের যে-ঋতুতে অসম্ভবের কুঁড়ি ধরার কথা, তখনই যারা মুনফার চুলচেরা হিশেব করতে বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। নিষ্প্রাণ চাকরি, ব্যবসাদারি বিয়ে, কর্মজীবনে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা—মোটের উপর এমন একটি স্থাবর ও ক্ষীণদৃষ্টি মনোভাব, যা জীবনের যে-কোনোরকম বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই ; আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।

এরই মধ্যে 'কয়েকটি কবিতা'য় খাঁটি নবযৌবনের দেখা পেলাম। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ-বিদ্রোহ নতুন নয় ; কিন্তু সমর সেনের সুর নতুন ব'লেই বিষয়ও নতুন মনে হয়। প্রথম অংশের কবিতাগুচ্ছ লিরিকধর্মী ; সেখানে শুধু সুরটাই আমরা শুনি, তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায় না। সুরে ধরা পড়েছে হঠাৎ মনের এক-একটি ঝোঁক ; আর সেই ঝোঁকের একটি বিশেষ চেহারাও আছে। বাংলা গদ্যছন্দকে এই তরুণ কবি যে-রূপ দিয়েছেন, সেটা আর কারোরই নয় ; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। এ-গদ্য গল্পে বা প্রবন্ধে ঠিক ব্যবহার্যই নয় ; এ যেন বিশেষভাবে কবিতারই বাহন। 'কয়েকটি কবিতা' বইখানা ছোটো, কবিতাগুলোও ছোটো-ছোটো, একটি ছাড়া প্রায় সব ক-টি কয়েক লাইনে পর্যবসিত। কিন্তু এই রূপের অভিনবত্বই শেষ কথা নয় ; এই ছোটো বইখানার মধ্যেই আছে

পরিণতির আভাস। কাব্যের রূপ দখলে আনার প্রাথমিক চেষ্টার অল্প পরেই দেখা যায়, ভিতরকার কথাটা চাপা আলোর মতো বিচ্ছুরিত। শক্তিশালী তরুণ কবি প্রথম উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে যে-আতিশয্য ক'রে থাকেন এবং যে-আতিশয্য মার্জনীয়, এমনকি শ্রদ্ধেয় হ'তে পারে—অবাক হ'য়ে দেখছি এই রচনাগুলিতে তার কোনো চিহ্ন নেই। প্রায় প্রথম থেকেই এই পরিণত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব শক্তিশালী কবিতেও বিরল। সেটা আছে ব'লেই সমর সেনের প্রভাব, বিষয়বস্তু ও কলাকৌশল উভয় দিক থেকেই, নতুন উদ্যোগীদের মধ্যে তো বটেই, কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠাবান কবিতেও দেখা যাচ্ছে—প্রায় তাঁর প্রথম কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হবার পর থেকেই।

এ-কথাও বলবো, যে সমর সেনের পরিণতির এটা প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র। আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হবে। 'কয়েকটি কবিতা'র রচনাগুলো মোটামুটি একই ধরনের; শব্দ ও বাক্যাংশ, উপমা ও বিশেষণের পুনরুক্তি কিছু দূর পর্যন্ত অনিবার্য ব'লে মেনে নিয়েও বইখানার ছোটো আকারের পক্ষে কিছু বেশি ব'লে মনে হয়। তাছাড়া পরিবর্তন প্রয়োজন; কেননা পরিবর্তনের ভাঙাচোরার ফলেই নতুন গঠন সম্ভব হয়। কোনো কবি হয়তো একটি কাব্যরূপ একবার পেয়ে যান—তারপর সেটারই মোহে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন, শুরু হয় নিজের অনুকরণ। এটা বড়ো শোচনীয়। বাংলা কাব্যে এর চমৎকার উদাহরণ 'মরীচিকা'র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেতে না-পারলে বড়ো কিছু করা যায় না, এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। সমর সেনের এখন একটা মোড় নেবার সময় হয়েছে।

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো,
রাত্রে ধূসর প্রেম: কুসুমের কারাগার।
কতো দিন, কতো মন্থর দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুরাত্তি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

—পুরো বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলাম। গদ্যের ছন্দটি নিখুঁত; পর-পর কয়েকটি জোরালো রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর ইঙ্গিতময় ছায়া-ছবি। আশা করি যে-নাবিকের গান কবির কানে

এসে পৌঁচেছে, তার টান তাঁর কাব্যকে নিয়ে যাবে দূর সমুদ্রে, জয় করবেন তিনি নতুন কল্পনার উপনিবেশ, বাংলা কাব্যকে দিগন্তবিহারিণী করবেন ঢেউয়ের আঘাতে আর ঝড়ের ঝাপটায়। আর এই যাত্রার শেষ প্রান্তে যে-নিবিড় সবুজ তটরেখা অপেক্ষা ক'রে আছে, তার পূর্বাভাস যেন এখনই ধরা পড়েছে নবযৌবনের বিষণ্ণমধুর দীর্ঘশ্বাসে।

> অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
> সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
> আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
> রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
> আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ। ('মহুয়ার দেশ')

১৯৩৭

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : অর্কেস্ট্রা

কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে : যাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন, আর যাঁরা ভেবে-চিন্তে লেখেন ; যাঁরা কবিতা লেখেন না-লিখে পারেন না ব'লে, আর যাঁরা লেখেন লিখতে হবে ব'লেই। কোনো-কোনো কবি আছেন স্বভাবতই মাতাল, কোনো-কোনো কবি নিতান্তই প্রকৃতিস্থ। প্রথম জাতের কবিদের আবেগই হ'লো উৎস, দ্বিতীয় জাতের কবিরা বুদ্ধিনির্ভর। কবিতার এই দুটি ভাবে কখনো মেলামেশা হয় না এমন নয়, তবু এই আলাদা দুই জাত স্পষ্ট চেনা যায়। শেলি, ওঅর্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাতের ; মিলটন, মধুসূদন, মোহিতলাল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত।

সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম দলে না-ফেলে বরং দ্বিতীয় দলে ফেলবো। স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকবি হিশেবে দেখতে গেলে তাঁর প্রতি সুবিচার হবে না। গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্তি নেই তাঁর রচনায় ; যে-মায়ার স্পর্শে অতি তুচ্ছ নিত্যব্যবহৃত শব্দ কবিতা হঠাৎ নতুন প্রাণ পেয়ে কথা ক'য়ে ওঠে, তার বেসাতি সুধীন্দ্রনাথ করেন না। তাঁর শব্দব্যবহার শিক্ষিত ও যথাযথ, চিন্তা ও যত্নপ্রসূত ; সংস্কৃতে যাকে বলা হ'তো 'শাস্ত্রকবি' তাঁকে তা-ই বলতে ইচ্ছে করে।

তবে এটা যদি ধ'রে নিই যে তিনি কবিতা লেখেন আত্মপ্রকাশের অনিবার্য তাগিদে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হিশেবে, তাহ'লে তাঁর এই 'অর্কেস্ট্রা' বইতে অনেক ভালো জিনিশ আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। তিনি কবি যতটা, তার চেয়ে কারিগর ঢের বেশি ; এবং কারিগরিতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ 'অর্কেস্ট্রা'র প্রতি পাতায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তিনি কেবলই কারিগর।

> লক্ষ-লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
> অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিলো দিকে দিগন্তরে
> স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝংকার।
>
> তোমার উড্ডীন কেশপাশ
> মলয়ের তপ্তস্পর্শে ধাম্যসম কেলিপরায়ণ
>
> নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ব-বিস্মরণ

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি যাঁর রচনা, তাঁর কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য। এ-সব স্থলে ছন্দের নিপুণ ঝংকার কোনো বিশেষ একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে—

সে-অনুভূতি স্পর্শসহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। মোহিতলালের 'বিস্মরণী'র এটিই ছিলো প্রধান গুণ। এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ অকপটেই নিজের কাব্যে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছেন, মোহিতলালের সঙ্গে, অন্তত অগভীর চোখে দেখলে, তাঁর কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে। ধ্বনিকল্লোলিত সাংস্কৃতিক পদবিন্যাসে উভয়েরই আনন্দ, উভয়েই দেহবিলাসী, ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক—মৌল অর্থ স্মরণ করলে হয়তো শুধুই তান্ত্রিক বলা যায়। উভয়েই ইন্দ্রিয়বাসনাকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁদের কাব্যে। সুধীন্দ্রনাথের বর্ণিত প্রেম একবারের বসন্ত-বন্যাতেই নিঃশেষিত; তাঁর নায়ক-নায়িকা স্বীকার ক'রেই চপল। এই চপল প্রেমের প্রকাশ-ভঙ্গিতেও চপলতায় অভ্যস্ত হয়েছি আমরা: দেখেছি হেরিকের প্রজাপতি-পাখার সঞ্চালন, আর প্রকাশ্য হাসির সঙ্গে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বেদনার মিশ্রণে হাইনের ও 'ক্ষণিকা'র কৃতিত্ব। সুধীন্দ্রনাথের গম্ভীর ও জটিল রচনাভঙ্গির সঙ্গে এই ভঙ্গুর দেহনির্ভর প্রেমের একটা অসংগতি আছে ব'লে মনে হয়। এটা বুঝতে পারি এই কারণে যে এই কথাটাই তিনি যেখানে হালকা ক'রে বলেছেন—যেমন 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার একটি লিরিকে ('খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম তোমার প্রেমে')—সেখানে আমাদের উপভোগ কোথাও পীড়িত হয় না, সম্পূর্ণ এবং অকুণ্ঠভাবেই ভালো লাগে।

'অর্কেস্ট্রা'র নাম-কবিতাটির উচ্চাশা ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে কিনা জানি না। এক দিকে চলেছে সংগীতের বর্ণনা; অন্য দিকে সেই সংগীত যে-সব স্মৃতির ঢেউ তুলছে কবির মনে, তারই প্রকাশ চলেছে লিরিকের পর লিরিকে। সেই লিরিকগুলো মিলে যেন বাণীহীন সংগীতকে মূর্তি দিতে চাইছে ভাষায়। এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সুধীন্দ্রনাথ নিপুণ শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। লিরিকগুলো ছন্দের দোলায় কর্ণেন্দ্রিয়কে আদর করে, এবং এর দুটি বা তিনটি নিঃসন্দেহে বঙ্গ-গীতির স্বর্ণ-ভাণ্ডারে স্থান পাবার যোগ্য। আবার বলি, সুধীন্দ্রনাথ ওস্তাদ কারিগর, ছন্দ তাঁর সর্বদাই নিখুঁত, 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার বর্ণনার অংশে আঠারো মাত্রার পয়ার নিয়ে যে-দুঃসাহসী পরীক্ষা তিনি করেছেন তাতে আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি। পয়ারে যতিপাতের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান আছে, তার ব্যতিক্রম হ'লেই কানে খটকা লাগার কথা, অথচ যেখানে তা লাগে না, যেখানে নিয়মভঙ্গের ফলে নতুন সুখকর ধ্বনির সৃষ্টি হয়, সেখানেই আমরা স্বীকার করি কবির অসামান্য দক্ষতা। মধুসূদনের 'অকালে'র পরে যতিপাত যে-বিস্ময়ের আন্দোলন

তুলেছিলো আজও তা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। সুধীন্দ্রনাথ পয়ারকে ভেঙে-চুরে মুচড়িয়ে যেমন খুশি চালিয়েছেন, চালিয়ে নিতে পেরেছেন একমাত্র প্রবহমানতার জোরে—মধুসূদনেরও সেই জোরই ছিলো। এ-ধরনের পরীক্ষা আরো করলে সুধীন্দ্রনাথ আমাদের পয়ারের পরিধি বহুদূর বাড়িয়ে দিতে পারবেন, এই আমার বিশ্বাস।

১৯৩৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ক্রন্দসী

আধুনিক বাঙালির কাব্যসাধনার বিশেষ-একটা দিক ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কয়েকজন সজীব ও সক্রিয় কবি আছেন, যাঁদের ঝোঁক বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগের দিকে। এঁদের ছন্দও তাই কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটু ঢিলে হবার জো নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন; রচনাবিন্যাসে অন্যমনস্কতারই কোনো প্রশ্রয় নেই এঁদের কাছে।

এই শ্রেণীর কবির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে উল্লেখযোগ্য। এই দুই কবিতে সাদৃশ্য যতখানি, বৈসাদৃশ্য যদিও তার চেয়ে কম নয়, তবু মোটের উপর এঁদের সমগোত্রীয় ব'লে মনে করলে ভুল হয় না। এঁদের রচনার কঠিন উজ্জ্বলতা আমার ভালো লাগে—যদিও স্বীকার করবো এঁদের কোনো-কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না। শক্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে নানা পুঁথিপত্র ও অভিধান ঘাঁটলে তবে হয়তো এই জাতের কবিতা সম্পূর্ণ বোঝা যায়, কিন্তু সেই ধরনের 'বোঝা'র উপরই আমার খুব বেশি আস্থা নেই, এমনকি কবিতার রসগ্রহণে সেটাকে অপরিহার্য ব'লে আমি মনে করি না। সত্যি বলতে, কবিতা 'বোঝা'টাই যে সমস্ত কথা, এমনকি মস্ত কথা, তা আমি মানতে ইচ্ছুক নই। কোনো কবিতায় হয়তো ছন্দের দোলাটাই শুধু উপভোগ করি; কোনো কবিতা বিশেষ-একটা উপমা কি রূপক-ব্যঞ্জনার জন্যই মূল্যবান মনে হয়; কোনো কবিতার দুটো লাইন হঠাৎ মনের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হ'য়ে যায় যে পথে চলতে-চলতে হঠাৎ নিজেকে তা গুনগুন করতে শুনি। তখনই বুঝতে পারি সে-কবিতায় কিছু সারবস্তু আছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও আমার উপভোগের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যবধান দেখতে পেয়েছি। তাঁর কবিত্বশক্তিকে স্বীকার ও সম্মান না-করা অসম্ভব; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার মেজাজের মিল নেই। তবু এ-কথা স্বীকার করবো যে যখনই তাঁর কবিতা পড়ি, তখনই মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারি না। 'অর্কেস্ট্রা'র কলাকৌশলের অভিনবত্বে, ও ছন্দের কৃতিত্বে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম, 'ক্রন্দসী'তে আরো খানিকটা পরিণতি পাওয়া গেলো।

পরিণতিটা বিষয়বস্তুর। কবি বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী। অনেকগুলি কবিতাতেই আছে নিষ্ঠুর আত্মপরীক্ষা।

'প্রার্থনা', 'স্বপ্ন', 'অকৃতজ্ঞ', এ-সব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত সমাজবিধি ও সংস্কারের সারাম আশ্রয়ের উপর তিনি বিদ্রূপের চাবুক চালিয়েছেন। বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন জীবনের ব্যর্থতা। মায়াবী জীবনের হাতে অবিরাম ঠকতে হয়, সে আশা জাগায় মহত্তের, কিন্তু দেয় শুধু তুচ্ছতা।

> সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে
> চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে। ('জাতিস্মর')

সিনেমা থেকে বেরোতে ভিড়ের মধ্যে 'চির অপরিচিতা' দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো—

> শুধু তুমি অন্তর্হিত, ভ্রষ্ট লগ্ন, সমাপ্ত সুযোগ।
> আবার নিষ্ফল হ'লো আজন্মের বিরাট উদ্যোগ। ('সিনেমায়')

তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা এই :

> জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
> নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
> শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
> মানসীর দিব্য আবির্ভাব
> সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী, ('নরক')

কবির মধ্যে একটা অস্থিরতা এসেছে। এই কবিতাগুলি সন্ধানের। কিসের সন্ধান? নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, আবেগবর্ণহীন প্রজ্ঞার। তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা, জীবনের সুখ দুঃখ ভয় আশার অতীতে এক 'অনাথ চিরসত্তা।'

> জীবনগণিকা
> ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
> সার্বজন্য অভিসারে ডেকে
> ভুলাবে কি পুনর্বার আত্মহারা পুরাণপুরুষে? ('প্রত্যাখ্যান')

জীবন নানা রঙের নানা ছলনায় ভোলায় ব'লে তাকে তিনি ঘৃণা করেন, অথচ তাঁর অভীষ্টও অপ্রাপণীয়। মনে হয় 'নির্গুণ নির্বাণে'র অবস্থায় কখনোই বুঝি পৌঁছনো যাবে না। গভীর বিতৃষ্ণার সুরে তিনি স্বীকার করেন :

> নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ;
> নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় অলক্ত হৃদয়...
> কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
> অনন্তপ্রয়াণ মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা। ('সৃষ্টিরহস্য')

অর্থাৎ, জগৎটা যে চলছে সেটা জলন্ত বাসনার বলেই, নিরাসক্ত নিরঞ্জন বুদ্ধির বলে নয়। ব্যর্থতা ও হতাশা কবি তাই মেনে নিয়েছেন নিজের ভাগ্য ব'লে।

আদর্শ হিশেবে এটা আমার মনঃপূত হয় না। কেননা আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধিপ্রসূত বৈরাগ্যের সমাপ্তি বন্ধ্যাতায়। কবির পক্ষে এটা অসংগত। জীবনের সমস্ত উপঢৌকন ত্যাগ ক'রে কবি কোথায় পৌছলেন? কোনোখানেই না।—কী পেলেন তার বদলে? কিছুই না। কী তাঁর দেবার আছে? কিছুই নেই। এই পৃথিবীতে আমাদের বিচিত্র জীবনলীলার নানা আবছায়ায়, নানা আঁকাবাঁকায়, নানা ইঙ্গিতে আলো ফেলবেন যে-কবি, যে-কবি জীবনকে দেখবেন ও দেখাবেন, আমাদের আরো বেশি ভালোবাসতে শেখাবেন, কবি উপাধির প্রকৃত অধিকারী কি তিনিই নন?

সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমার আনন্দ বাক্যে।' কথাটা সত্য। কিন্তু যে-জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে ওঠে, যাতে কয়েকটি সহজ কথার সংযোজনায় জীবনের কোনো গূঢ় প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়, বাক্যের সেই ঐন্দ্রজালিক সাধনার পথে তিনি চলেন না। কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন ক'রে বাস্তুশিল্পী ব্যবহার করে ইষ্টক; অতি সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে কবিতাকে গঠন করেন তিনি; তাঁর মন তার্কিকের, তাত্ত্বিকের, গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরনটা তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। সেইজন্য, যদিও আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য, শব্দার্থ ও উল্লেখগুলো বের ক'রে নিয়ে আস্তে-আস্তে পড়লে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হ'তে পারে। এখানে তাঁর বন্ধু বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ। উল্লেখ ও শব্দার্থ জেনে নিলেই বিষ্ণু দের কবিতা সরল হ'য়ে যায় না; বক্তব্যের ধাপগুলি মাঝে-মাঝে বাদ দিয়ে যাওয়া তাঁর অভ্যাস, ফলে তাঁর চিন্তাধারা যথাযথরূপে অনুসরণ করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়। তাঁর কবিতার চেহারাটা, তাই, অসংলগ্ন ও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে ওঠে; কিন্তু অসংলগ্নতা সুধীন্দ্রনাথের বিভীষিকা। এদিক থেকে তিনি বিষ্ণু দের ঠিক বিপরীত; দর্শনের যুক্তির মতো, বা জ্যামিতির প্রস্তাবের মতো, তাঁর কবিতাকে ধাপে-ধাপে অনুসরণ করা যায়; প্রতিটি পংক্তির ও শব্দের 'অর্থ' সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত সেখানে।

সুধীন্দ্রনাথ কুশলী নির্মাতা, তাঁর কবিতা ঘন ও সাকার, ইংরেজিতে যাকে বলে সলিড। আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশের নিখুঁত ভারসাম্য তিনি এমনভাবে বজায় রেখে চলেন যা হুবহু পোপ ও ড্রাইডেনের অ্যান্টিথিসিস-নির্ভর 'হিরোয়িক কাপলেটে'র কথা মনে করিয়ে দেয়।

> **মেঘার্ত পাণ্ডুর শশী, শঙ্কাকুল প্রাবৃণশর্বরী;**
> **নিঃস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী। ('কুক্কুট')**

চতুর অনুপ্রাসে, ব্যঞ্জনবর্ণের ঠাশবুনোনে, তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে ধ্বনিকল্লোলিত ক'রে তোলবার কৌশল তাঁর জানা :

ডাহুক, সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল
নির্বিঘ্ন তিব্বতপানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দিনে।
চক্রচর চর্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে।
প্রেতসঞ্চারিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা বাচাল। ('কুক্কুট')

এ-বইয়ে যে-কবিতাগুলি বিশেষরকম ভালো, যেমন 'প্রার্থনা' 'প্রশ্ন' 'মৃত্যু', 'ভাগ্যগণনা', 'নরক', 'প্রত্যাখান' সবই অসমমাত্রার পয়ারে লেখা, ঝোঁকটা নাটকীয় উক্তির। ছন্দের গতি অবাধ ও মন্থর, স্বচ্ছন্দ ও গম্ভীর। অবশ্য একটি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে—'উটপাখি'—তিন মাত্রার ছন্দে, এবং তিন মাত্রাতেও কবির দক্ষতা অসামান্য।

বর্বর বায়ু চিরায়ু অচলচূড়ে ('জাতিস্মর')

উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি ('উটপাখি')

এ-সব পংক্তি ভুলে যাবার মতো নয়।

এ-কথা ব'লে এই আলোচনা শেষ করি যে বাংলা কবিতার নতুন পরিণতির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথকে একজন প্রধান কর্মী ব'লে মেনে নিতে এখন আর বাধা নেই। তাঁর কবিতা সশ্রদ্ধ পঠন ও আলোচনার যোগ্য ; তাঁর নির্মাণের কলাকৌশল, তাঁর পুর্ণমনস্ক গঠনকর্ম আমাদের এই অতি শিথিল অতি তরল রচনার দেশে সত্যই মূল্যবান।

১৯৩৭

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

'কালের পুতুলে'র কোনো-কোনো আলোচনা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়নি এ-কথা সবচেয়ে বেশি জানি আমি, আর সে-দুঃখ সবচেয়ে বেশি আমার। কিন্তু প্রতিকারের সময় আর নেই। বিষ্ণু দে আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে রচনা দুটি অর্ধ-মনস্ক হয়েছে, বইয়ের প্রুফ দেখতে-দেখতে এ-চিন্তা আমার মনকে বার-বার পীড়া দিয়েছে। বিষ্ণু দে সম্বন্ধে গত ক-বছরে নানা দিক থেকে নানা রকমের আলোচনা হয়েছে ব'লে তাঁর প্রসঙ্গে আমি যে ভালো ক'রে বলতে পারিনি সেজন্য নিজেকে তবু ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিত্তহারী কবিতাগুলি নিয়ে কোনো ভালো আলোচনাই এ-পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি, এবং আমি নিজেও যে তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারলাম না, এ-দুঃখ আমার অনপনেয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার 'মনের কথা মনের মতো ক'রে' আবার বলবো, এ-রকম একটা ইচ্ছা নিয়ে খেলা করেছি অনেকদিন, কিন্তু জীবনে আর হয়তো সময় হবে না, তাই এখানেই ব'লে রাখি যে 'প্রগতিশীল' দল যদিও 'ক্রন্দসীর'ই বেশি সুখ্যাতি করেছিলেন, এবং আমিও 'ক্রন্দসী'কে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশি পরিণত বলেছি, তবু এ-কথাই সত্য যে 'অর্কেস্ট্রা' একটি আশ্চর্য বই, কতগুলি বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে 'ক্রন্দসী'র গৌরবের লঘুকরণে আমি ইচ্ছুক, কিংবা এও নয় যে সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা বইয়ের মধ্যে 'অর্কেস্ট্রা'কেই আমি শ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করছি—যদিও এই শেষের প্রস্তাবে আমার লেখনীর লুব্ধতা অনস্বীকার্য। সে-লোভ আমি যদি সংবরণ ক'রে থাকি তা এই কারণে যে শিল্পকলার আলোচনায় শ্রেষ্ঠ কথাটা কখনোই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয় না; কোনটা ভালো তা বলা যায়, কিন্তু কোনটা কোনটার চেয়ে বেশি ভালো তার অনুভূতি নির্ভর করে মনের ভিন্ন-ভিন্ন গড়ন, একই মনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঝোঁক, এমনকি ঋতুবৈচিত্র্যের প্রভাবের উপর—তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির পারস্পরিক তুলনার প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, কেননা 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী', এ-তিনখানা আসলে একখানাই বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়, তিনটি বইয়ের ভিতর দিয়ে একটি কথাই তিনি বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা বই যেন তিনটি যন্ত্র, স্ব-তন্ত্র, কিন্তু সমতন্ত্রী, স্বর তাদের আলাদা কিন্তু সুর এক, ভঙ্গি তাদের বিচিত্র কিন্তু বিষয়, যাকে বলে থীম, সেটা অভিন্ন।

যে-কথা বিশেষভাবে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য, সেটি সবচেয়ে অখণ্ডরূপে,

সবচেয়ে প্রচণ্ড তেজে প্রকাশ পেয়েছে 'অর্কেস্ট্রা'য়, তাই এ-বইটিকে শ্রেষ্ঠ না-ব'লেও বলতে পারি সর্বলক্ষণসম্পন্ন। নাম-কবিতাটির উচ্চাশা সিদ্ধ হয়নি, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটির হয়েছে—এর মধ্যে এমন একটি ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে, ভিন্ন-ভিন্ন কবিতাগুলি রসের দিক থেকে এমন পরস্পর-সংলগ্ন যে শেষ পর্যন্ত কবিতাগুলি একত্র হ'য়ে একটি কবিতার মতো, এবং সেই কবিতা একটি পংক্তির মতো হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। 'অর্কেস্ট্রা'তে কবি একটি প্রেমের সংগীতের উচ্চতান তুলেছেন: অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণবের লালিত্য-লালিত বাংলা কাব্যে সে-প্রেম ভাবের দিক থেকে বিস্ময়কর, পারিপার্শ্বিকেও বিধর্মী। নায়িকা বিদেশিনী ও তরুণী, নায়ক ভোগক্লান্ত রস-তৃষ্ণার্ত যুবা, কিন্তু তরুণ নয়, প্রেমের সংঘটনস্থল বিদেশ, আর তার স্মরণের লীলাভূমি সপ্তসিন্ধুপরপারে কবির মাতৃভূমি। সমস্ত নিবিড় নাট্যটিকে দেখা হয়েছে স্মৃতির মধ্য দিয়ে: বর্তমান কবির কাছে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবন্ত শুধু স্মৃতি-প্রজ্বলন্ত অতীত, সেই অতীতের আগ্নেয় সংরাগে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা দীপ্তিময়। মিলন-যজ্ঞে চরম আত্মাহুতির সঙ্গে-সঙ্গে অন্তিম বিচ্ছেদের প্রলয় নামলো—তারই পিঙ্গল পটভূমিকা দেখতে পাই 'অর্কেস্ট্রা'য়। কবিতা-গুলিতে একটা রুদ্ধশ্বাস দুঃসহ বেদনাবোধ আছে, যেটাকে সুধীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় 'ভবিতব্যভারাতুর'। 'ভবিতব্য' কথাটি বার-বার ফিরে আসছে শুধু 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, অন্য দুটি গ্রন্থেও, কিন্তু আমরা অদৃষ্টবাদ বলতে যা বুঝি এ ঠিক তা নয়, এতে পরলোকের আশা নেই, পরজন্মের আশ্বাস নেই, একে বলা যায় পেগান মনোভাব, অন্ধ, অধার্মিক, আধিভৌতিক, নির্মম অনতিক্রম্য নিয়তিচেতনায় পরিপূর্ণ। আমাদের আধুনিক কাব্যে মোহিতলাল একটি শাক্ত সুর লাগিয়েছিলেন, তাঁর শক্তি-সাধনা দর্পিত পেশীতে প্রকট, পরিস্ফীত শিরায় দৃশ্যমান। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদের মতো মোহিতলালের দেহবাদও প্রতিক্রিয়ার ফল—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, সত্যেন্দ্র দত্তেরও বিরুদ্ধে—এবং সেই হিশেবে সেটা বাইরে থেকে অর্জিত জিনিশ। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথে যে-ভাবটি পাই সেটি যে তাঁর আন্তরিক, তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে রবীন্দ্ররীতি বর্জন করবার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি, বরং যথেচ্ছ আহরণ করেছেন রবি-শস্যের স্বর্ণরাশি থেকে; রবীন্দ্রনাথের শব্দসমাবেশ, এমনকি বাক্যাংশ, অনায়াসে চালিয়ে দিয়েছেন নিজের রচনার মধ্যে—বিষ্ণু দে-র মতো সচেতনভাবে, ব্যঙ্গের ইঙ্গিতে, কিংবা কবিগুরুকে আধুনিক সাজ পরাবার ভঙ্গিতে নয়—রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অন্তরেই বিরাজমান এ-কথা সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বেশ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন; অথচ সর্বত্র, সমভাবে এবং সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যই তাঁর ধরা পড়েছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের মতো নন এ-কথা প্রমাণ করবার জন্য কোনো বিচিত্র কৌশল

তাঁকে অবলম্বন করতে হয়নি, রবীন্দ্রনাথের আস্ত-আস্ত বচন ব্যবহার ক'রেও তিনি তাঁর নিঃসংশয় স্বকীয়তার শিখরে প্রতিষ্ঠিত।* সাধারণত দেখা যায় সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা যুগবিভাগ ও গোষ্ঠীবিভাগ করতে ভালোবাসেন; লেখকদের দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে, এমনকি হাত-পা কেটে, যে-কোনোরকমে একটা যুগ বা সম্প্রদায় বা মতবাদের বস্তার মধ্যে পুরতে পারলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি এতে সুবিচার হয় না, ভোক্তার প্রতিও না। এমন আশঙ্কা অনর্থক নয় যে অনতিদূর ভবিষ্যতে কোনো-এক অধ্যাপক কোনো-একদিন হঠাৎ জেগে উঠে মোহিতলাল আর সুধীন্দ্রনাথকে একই দেহবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দেবেন, ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে একটা 'fleshly school of poetry' গজিয়ে উঠতেই বা কতক্ষণ। সেইজন্য সুধীন্দ্রনাথকে শাক্ত কবি বলতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম, তাঁকে বরং বলা যেতে পারে—যা আগেই বলেছিলাম—মৌল অর্থে তান্ত্রিক। যে-বলশালী পৌরুষের সফেন উচ্ছ্বাসে মোহিতলালের অভিজ্ঞান, সুধীন্দ্রনাথের মনোধর্মের তা বিরোধী। সুধীন্দ্রনাথের তনু-তন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর আভিজাতিক সুমিতি, তাঁর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর। সুদৃঢ়, প্রগাঢ়, চিন্তা-ছায়াচ্ছন্ন তাঁর কবিতাগুলির সঙ্গে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়া সহজ নয়। আমাদের চিরাচরিত প্রত্যাশা পূরণ করেন না তিনি। 'অর্কেস্ট্রা' প্রেমের কবিতা, অথচ এতে পূর্বরাগ নেই, অভিসার নেই, অভিমান নেই, নেই সুখ, নেই সুখের চেয়েও সুমধুর বিষাদ, নেই লাস্য, নেই নৃত্য। এলিজাবিথান গীতবিতানের মতো কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয় 'ক্ষণিকা' কিংবা 'মহুয়া'র মতো। নায়িকার দেহ ছাড়া কিছু দেবার নেই, আর সেই দেহের স্মৃতি ছাড়া কিছু সম্বল নেই নায়কের। বিচ্ছেদের দিনে মিলনরাত্রির দুরন্ত স্মৃতিবন্যায় সমাজ-সংসার সব ভেসে গেছে। সমাজের প্রতি, নীতিধর্মের প্রতি অপরিসীম অবহেলায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অফুরন্ত মহিমা উচ্চারিত হয়েছে বার-বার—কবিতাগুলি আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, নিষ্ঠুর—বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়,

* লোকমুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'তে হয়তো এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু 'তন্বী' কখনো আমার চোখে পড়েনি, আর এখানে তাঁর পরবর্তী কবিতাবলি বিশেষ ক'রে 'অর্কেস্ট্রা'ই, আমার আলোচ্য। এ-প্রসঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা' আরো বেশি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে 'ক্রন্দসী'র, এবং অংশত 'উত্তরফাল্গুনী'র তুলনায় এর বাক্‌বিন্যাস সবচেয়ে রবীন্দ্র-ঋণী হ'লেও এর আন্তরিক বিধর্মিতা অপ্রতিরোধ্য। 'সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তাঁর প্রতি আমার পক্ষপাত জ'ন্মে গেছে। তার একটি কারণ—তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসংকোচে—অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনজ্ঞের স্পর্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে। এই সাহস ক্ষমতারই সাহস।' ('কবিতা', পৌষ ১৩৪২) আমার মনে হয় না শুধু 'তন্বী'র উপর নির্ভর ক'রে রবীন্দ্রনাথ এ-কথাগুলি লিখেছিলেন, অনুমান করি সে-সময়ে সদ্যপ্রকাশিত 'অর্কেস্ট্রা'ই ছিলো তাঁর মনের সামনে।

মিলন-স্মৃতির দারুণতর মত্ততায় কবি কখনো চীৎকার ক'রে উঠছেন, কখনো তিনি হতাশায় মগ্ন, কখনো বা সেই স্মৃতিকঙ্কালকেই জীবনের পরম উপার্জনজ্ঞানে অঙ্কশায়ী ক'রে আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত, আবার কখনো এ-কথা ভেবে মোহ্যমান যে মহাদস্যু কাল জীবনের এই একমাত্র স্মৃতিরত্নকেও একদিন লুণ্ঠন ক'রে নেবে, নিবিয়ে দেবে সেই দুঃখের অগ্নিশিখা, যেটা তাঁর উপজীবিকা, তাঁর জীবন। কোনোদিকে কোনো সান্ত্বনা নেই তাঁর, কোনো আশা নেই, আশ্বাস নেই, মুক্তি নেই। আসক্তি তাঁর দুর্মর, বিরহ তাঁর নরক, প্রশান্তি তাঁর মৃত্যু। 'মেঘদূতে'র স্বপ্ন ব্যর্থ তাঁর কাছে, শকুন্তলার স্বর্গ অর্থহীন, তাজমহল প্রহসন মাত্র। দেহচ্যুত, দেহাতীত প্রেমসাধনার রোমাঞ্চ কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। অথচ এটা তারুণ্যের তন্ময়মুগ্ধ পৌত্তলিকতা মাত্র নয়, এ-পূজার পুরোহিত সেই পরিণত স্বাবলম্বী মন, যে মনের কোনো মোহ নেই, কোনো গৃহ নেই, যে-মন পুতুলের ভিতরে দেখতে পায় খড় আর মাটি, কিন্তু মাটি আর খড় ছাড়িয়ে প্রতিমাকে দেখতে পায় না, নাস্তিকতার অন্ধকারে বুদ্ধির সাহসিক রশ্মিটুকুর প্রজ্বলনে নিজেকে যে নিঃশেষ ক'রে দেয়। এ-মন দার্শনিকের, কবির নয়, কিন্তু একই সঙ্গে কবিত্বের আবেগকে যুক্ত ক'রে সুধীন্দ্রনাথ অসাধ্যসাধন করেছেন। বিচ্ছেদবেদনার যে-উত্তেজনা তাঁর কবিতাগুলির প্রাণ, একদিকে যেমন তার চরম ব্যঞ্জনা 'বর্বর বাঁশি'র মতো তীব্র দ্রুত উচ্চস্বরে অকস্মাৎ ধ্বনিত হয়েছে 'নাম' কবিতাটিতে, তেমনি অন্য দিকে এই অন্ধ মত্ততার পরপারে মুহূর্তের জন্য, শুধুই মুহূর্তের জন্য, একটু শান্তি, একটু মধুরতা, একটু বা বিশ্বাসের আবেশ তাঁকে যেন স্পর্শ করেছিলো 'শাশ্বতী' কবিতায়। মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রিয় তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলো, আসক্তি দিয়েছিলো মুক্তি, খুলে গিয়েছিলো সেই স্বর্গের দুয়ার, যেখানে একবার পেলে কখনো আর হারানো যায় না। তাই তো—

> একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
> ভর ক'রে ছিলো সাতটি অমরাবতী

এই তুলনাহীন পংক্তি দুটি তিনি লিখতে পেরেছিলেন।

কলাকৌশলের দিক থেকেও আরো একটু বলতে চাই। এ-ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বাংলা কথাগুলিকে তিনি প্রায়ই মৌল সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করেন। ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি তিনি বসাতে পারেন, তিনটি শব্দের বদলে একটিতেই কাজ চলে, এবং তার ফলে কবিতায় একটি মনোরম সংহতি আসে। কিন্তু সেই রম্যতা যেন রাধার কণ্ঠহার, পাঠকের সঙ্গে পূর্ণমিলনে সেটা বাধারও সৃষ্টি করে। এ-ক্ষেত্রে পাঠকেরও কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই, কবির সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁরও প্রস্তুতি আবশ্যক, কিন্তু ভোজ্য বস্তু রূপে-রসে ঠিক কী-রকমটি হ'লে তবে বলা যায় যে রান্না হয়েছে

আর ভোক্তার রসনাতেই বা কতখানি আস্বাদের শিক্ষা থাকলে তবে তাকে নিমন্ত্রণের যোগ্য ব'লে ধরা যায়, এই কঠিন তর্কের মধ্যে এখন যাবো না; আপাতত যদি ধ'রে নেয়া যায় যে কবি সকলের জন্যই লেখেন, যে পড়তে পারে তারই জন্য, এমনকি যে শুনতে পায় তারও জন্য, তাহ'লে বলতেই হয় যে কলাকৌশলে সুধীন্দ্রনাথের যা শক্তি, তা-ই তাঁর দুর্বলতা। আমি অনুভব করেছি যে তাঁর কবিতার গম্ভীর ধ্বনিগৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন অভিভূত হওয়া যায় না, প্রতি পংক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, কেননা শব্দগুলি পরিচিত হ'লেও তার ব্যঞ্জনা অপ্রচলিত। সম্পূর্ণ কবিতাটি মনের মধ্যে ধরা দিলে পুলক লাগে, কিন্তু ধরা দেবার দীর্ঘ পথটি পার হ'তে-হ'তে তার রস কি একটু ঝ'রে যায়, একটু কি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে সুসজ্জিত বাক্যবাহিনী? আমি যে বলেছিলাম সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর আমার উপভোগের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যবধান দেখতে পেয়েছি, নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি সে-ব্যবধান এইখানে। যদিও তাঁর দু-একটি কবিতা (যেমন 'উত্তরফাল্গুনী'র 'প্রতিপদ') এখনো তার হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে উন্মোচন করেনি, তবু বলতে পারি যে প্রথম পরিচয়ের সেই ব্যবধান এতদিনে আমি অতিক্রম করতে পেরেছি। কিন্তু আমি পেরেছি ব'লে সকলেই কি পারবে? না-ই বা পারলো, কয়েকজন বাছা-বাছা পাঠক হ'লেই সুধীন্দ্রনাথের চলবে। তবু, 'একটুখানি মোহ' মনের মধ্যে থেকেই যায়; ইচ্ছে হয় আমার যা ভালো লেগেছে, আমি যাকে ভালো ব'লে জেনেছি, তা সকলেই ভালো ব'লে স্বীকার করুক। এবং সেই ইচ্ছাই এই পুস্তকের জন্মভূমি।

১৯৪৫

বিষ্ণু দে : 'চোরাবালি'

প্রিয়বরেষু,

আপনার সঙ্গে—ও আপনার লেখার সঙ্গে—আমার দশ বছরের পরিচয়। ঢাকা থেকে অজিত দত্ত আর আমি 'প্রগতি' পত্রিকা চালাচ্ছি, এদিকে 'কল্লোল' বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার আগে তীব্রভাবে আলোড়িত হচ্ছে, সেই সময়ে আমাদের সাহিত্যগোষ্ঠীর উপান্তে মাঝে-মাঝে আপনাকে দেখা যেতো। আপনার কবিতা তখন থেকেই আমার ভালো লাগে। সেই সময়ে 'প্রগতি'তে আপনার প্রচুর লেখা বেরোতো; তার অধিকাংশই লঘুরসের পদ্য। সেই পদ্যগুলো 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ডিঙিয়ে সবই দেখছি এই বইয়ে স্থান পেয়েছে—এমন কি 'ডল্লুটা যখন ন্যাকামি করে'ও বাদ যায়নি। তার মধ্যে ট্রিওলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না-রেখে যে ভাবে পারম্পরিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করেছেন তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

'চোরাবালি'র অনেক রচনাই দেখছি হয় 'প্রগতি'তে নয় 'কবিতা'য় বেরিয়েছিলো, অতএব তাদের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির অবস্থা থেকেই আমার পরিচয়। অন্যান্য রচনা প্রায়ই আমার অপরিচিত নয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় আপনার 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি আমি এই প্রথম পড়লুম। দৈবক্রমে 'পরিচয়ে'র ঐ সংখ্যাটি আমার চোখে পড়েনি। কোনো সন্দেহ নেই, 'ঘোড়সওয়ার' একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা, বর্তমান যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ-কথাও বলবো, এই কবিতা যে-কোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয় হ'তো। ছন্দের উপর—বিশেষত তিনমাত্রার ছন্দে—আপনার সহজ অধিকার আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। 'ঘোড়সওয়ারে' ধ্বনির উত্থান-পতন এমন অভ্রান্ত, অনিয়মিত মিলের ও আকস্মিক অনুপ্রাসের বিস্ময় এমন সংগত ও সুন্দর, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ এমন নিখুঁত যে পুরো কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সংগীতের মতো মনের মধ্যে হানা দিতে থাকে।

> কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
> কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
> হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
> হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।

শেষের পংক্তিটিতে ঠিক যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তা ছাড়া এ-কবিতার অন্যতম গৌরব আমার কাছে এই যে একে হৃদয়ঙ্গম করতে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

আমি অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো-কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না। বিদ্বজ্জনের মুখে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'র নানা রকম দুরূহ ব্যাখ্যা শুনে আরো বেশি বিচলিত বোধ করি—ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটা আমার কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়। তবু, ও-দুটি কবিতাই আমি পড়তে ভালোবাসি; মাঝে-মাঝে চমকপ্রদ চিত্রকল্পের দেখা পাই; মনের মধ্যে বিচিত্র ছবি ফোটে, আর ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরের মোহ ছড়ায়।

> উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
> সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী হাসে,
> মরণ-মায়ারে হানো।
>
> এনেছিলে বটে হাসি।
> মেঘের রেশমি আড়ালে দেখিনি
> বজ্রের যাওয়া-আসা। ('ওফেলিয়া')
>
> সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
> প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
> মুখর সে-গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
> হালকা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?…
>
> পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
> পাঁচ পাহাড়ের নীল।
> বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
> স্তব্ধ নিথর পাঁচ সায়রের বিল। ('ক্রেসিডা')

এ-সব শ্লোক একবার পড়লে বার-বার পড়তে হয়, মগজের মধ্যে এরা গুনগুন ক'রে ফেরে, অন্যমনস্ক মুহূর্তে এদের আবৃত্তি করি। এরা সম্পূর্ণ ধ্বনি-নির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা করি না। আমার এক-এক সময় মনে হয় যে কবিতা যে আমাদের এমনভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তার ধ্বনিরই প্রভাবে, অর্থগৌরবে নয়। কবিতা যে কখনো পুরোনো হয় না, কখনো ফুরোয় না, কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে এক অনন্ত ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তার কারণ কি প্রধানত ধ্বনি নয়? ছন্দোবন্ধন নয়? সেই ধ্বনির উপর আপনার স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব; স-মিল গদ্যে আপনি যে পরীক্ষা করেছেন তাতেও তার পরিচয় পেয়েছি। অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিলেও, শুধু এই কারণেই কাব্যজগতে আপনার আসন স্থায়ী হবে।

আমার মনে হয়েছে তিনমাত্রার ছন্দে আপনার দখল যতটা পাকা,

পয়ারে ততটা নয়। পয়ারের বেগ ও বৈচিত্র্য আপনি তেমনভাবে অন্বেষণ করেননি। দু-এক জায়গায় শৈথিল্য ধরা পড়ে, যেমন :—

জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, জানি যে সে সাধারণই মেয়ে

'সাধারণই' কথাটা বেসুরো নয় কি ? তারপর

আমাদের যামিনী জাগর
কাটে নাকো, সংস্কৃত কবিতার নাগরী নাগর
কাটাত যেমন ;

এখানে 'সংস্কৃত' কথাটার উপর যে-ভার চাপিয়েছেন তা বইতে গিয়ে ওর উচ্চারণ বিকৃত হ'য়ে যায়। মোটের উপর, পয়ারে আপনার গতি ততটা আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক নয়। এখানে অবশ্য এও বলা দরকার যে

এই সব কথা লেকে বেজায় ভাবিত
করল, বিশ্বাস করো, খাঁটি কথা বলি,
সমাধানে কিছুতেই মন উপনীত
হল না,—ভাবনাবিষে নিদারুণ জ্বলি।

এখানে ছন্দের বায়রনি চটুলতা উপভোগ করেছি। উপরন্তু, 'প্রথম পার্টি' কবিতাটি পয়ারে আপনার শ্রেষ্ঠ—এবং সত্যিকারের ভালো—রচনা ; তার

কোলাহলহীন কোন অলৌকিক দেয়ালির আলো

এই একটি পংক্তিতে যা পেলাম তার মূল্য অনেক।

আপনাকে একটা কথা জিগেস করি : এ-বইয়ের ভূমিকার কী দরকার ছিলো ? ১৯৩৮-এ আপনার কোনো পরিচয়পত্রের দরকার নেই—আর যে-কোনো অবস্থাতেই একটি কাব্যগ্রন্থ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে—তাকে কেউ হাতে ধ'রে নিয়ে এসে সভায় বসিয়ে দিয়ে গেলো এটা কাব্যপ্রেমিকের কাছে বাহুল্য ব'লে বোধ হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই রচনাটি সমালোচনা হিশেবে প্রকাশিত হ'লে সব দিক থেকে বেশি ভালো হ'তো। আপনার কবিতার দুরূহতা তিনি সমর্থন করেছেন, কিন্তু সেটা উত্তীর্ণ হ'তে পাঠক তাঁর কাছ সাহায্য পাবে না ; বরং তাঁর ভূমিকাও এত দুর্গম যে আপনার কাব্যের বিষয়ে পাঠকের ঔৎসুক্য তা বাড়াবে কিনা সন্দেহ। সুধীন্দ্রনাথের ভূমিকা প'ড়ে যা মনে হয় আপনার কবিতা যে ঠিক তা নয়, এটা আমি সুখের বিষয়ই মনে করি ; অধীত বিদ্যার উপরে নির্ভর না-ক'রেও আপনার কবিতা উপভোগ করা যে সম্ভব আমিই তার প্রমাণ, কেননা, আমাকে যদি শব্দার্থ ও উল্লেখ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চয়ই ফেল করবো। তবে সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত

বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী ; এবং যে-পাঠকের পড়া-শুনা আমার চেয়ে বেশি, তিনি কবিতা দুটির মধ্যে আরও অনেক কিছু খুঁজে পাবেন', তখন তিনি আপনার উপর যে-বিরাট পাণ্ডিত্য আরোপ করেন, তা কবিতায় কী ভাবে ও কী পরিমাণে ব্যবহার্য সে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

আর-একটা জিজ্ঞাস্য। 'ক্রতুক্রতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ', (এমন আরো আছে), এই সব শব্দ ব্যবহার ক'রে সত্যি লাভটা কোথায় ? হয়তো কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয় না যে সৎপাঠক এ-সব শব্দে প্রতিহত হবে ?

আপনার কবিপ্রতিভায় আমি আস্থাবান ; এ-দেশে কবিতা যাঁরা ভালো-বাসেন, লেখেন ও লিখতে চেষ্টা করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই আপনার রচনা খুব মনোযোগপূর্বক পড়া উচিত সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই ; আর সেইজন্য যেখানেই আমার মনে হয়েছে আপনি যেন স্বেচ্ছায় ক'রে আপনার কবিতার আবেদন খর্ব করেছেন, সেখানেই আমার মন প্রতিবাদ করেছে। আশা করি নিজের সংশয়ভঞ্জনের আশায় যে-সব প্রশ্ন করেছি তাতে অপরাধ নেবেন না। পরিশেষে সুধীন্দ্রনাথের মারফৎ জানলুম যে আপনার মতো 'এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না।' তবে কিসের তাড়নায় লেখেন ?

১৯৩৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'পদাতিক'

দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে-সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভোগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এই ঈর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

অবশ্য এ-সম্মান কারো ভাগ্যেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, হওয়া উচিতও নয়। বাংলাদেশের যুবক কবিরা যে এমন অল্প সময়ে বয়োকনিষ্ঠতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আমাদের সকলের পক্ষেই এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। যুগান্তরকারী প্রতিভা হয়তো শতাব্দীতে একটির বেশি জন্মায় না, এবং প্রত্যেক শতকেও জন্মায় না, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিশ্রমী ও বিবেকবান কবির সংখ্যা বাড়ছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অনতিবিলম্বে তরুণতমতার গৌরব হারাবেন; তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাবার এইটেই সবচেয়ে শুভ লগ্ন।

অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এ-কারণেও নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে-পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে-কোনো আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ-কথার সাক্ষ্য দেবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য: প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিলো। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে ব'লে মনে করি।

তাঁর কাব্যের এই দুটি লক্ষণের মধ্যে প্রথমটি নঙর্থক, এ-আপত্তি স্বীকার্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে একটি বাঙালি ছেলে যে বয়ঃসন্ধি সময়েও প্রেমের কবিতা লিখলে না, এ-ঘটনাকে সম্পূর্ণ নঙর্থক ব'লে উড়িয়ে

দেয়া চলে না। কুড়ি বছর আগে, দশ বছর আগেও, এটা সম্ভব হ'তো না। এতে বোঝা যায় যে সময় বদলাচ্ছে। কেউ যেন মনে না করেন আমি এমন ইঙ্গিত করছি যে প্রেমের কবিতা না-লেখার মধ্যেই প্রশংসনীয় কিছু আছে; বরং আমি এটাই আশা করবো যে কোনো সামাজিক অবস্থাতেই প্রেমের কবিতা লিখতে আমরা ভুলবো না। আমি বলতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। হয়তো দুর্লক্ষণ। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হ'য়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।

কবিতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার ঝোঁক রবীন্দ্রনাথে দেখা গেছে বার-বার, আর রবীন্দ্রনাথের পরে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই তিনজন কবি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু প্রকৃতির উদার মুক্তি থেকে মনুষ্যসমাজের সংকীর্ণতায় তাঁরা নেমে আসেননি; যতীন্দ্র সেনগুপ্তের মতো কটুভাষী কবিও প্রকৃতির বর্ণনায় ও বন্দনায় মুখর। 'কল্লোল'-যুগের যে-সব কবিতায় বাংলা সাহিত্যের হাওয়া-বদলের খবর পাই, তাদের যুদ্ধঘোষণার লক্ষ্য ছিলো যে-মুক্তি, তা ব্যক্তির, সমষ্টির নয়। তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে ছিলো য়োরোপীয় রোমান্টিকতা ও প্রকৃতিবাদ, আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন অভিনব, আর তাঁর কাব্যে প্রেম কিংবা প্রকৃতির পরিবর্তে কোন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, সে-আলোচনা এখন সহজ হবে। তিনি অভিনব শুধু এই কারণে যে সমর সেনের পরে, এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য-কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই। তিনি স্পষ্টই বলেন:

> কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ—
> জানি, আজ নেই অন্য গতি;
> যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
> সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

শ্লোকটি বড়ো বেশি সহজ, কথাটা বড়ো বেশি স্পষ্ট; কবিতায় একটু বাঁকা ক'রে বললেই ব্যঞ্জনা গভীর হয়। কিন্তু এ-কথা এমনি সরল ও স্পষ্ট ক'রেই আমাদের নতুন কবিদের মধ্যে কোনো-একজন ঘোষণা করবেন, এ-প্রত্যাশা আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের পক্ষে অন্যায় নয়। বাংলা কবিতায় এই ধরনের অনুভূতি সমর সেনের ক্ষুদ্র রচনাগুলিতেই আমরা প্রথম পাই; আমাদের কাব্যজগতে যে-আন্দোলন

তিনি আনেন তার ফল এতদূর গড়িয়েছে যে এখন শক্তিশালী আধুনিক কবিদের অনেকেই সমাজবিপ্লবের আগমনী গাইছেন। কিন্তু সমর সেন নিজে মোহমুক্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাই বরাবর বজায় রেখে আসছেন; সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও দুরূহ উল্লেখের সাহায্যে ছাড়া বিষ্ণু দে-র মন কাজ করে না; আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় জ্যামিতির প্রস্তাবের মতোই ন্যায়-সম্মত কবিতাসমূহে ধ্বংসোন্মুখ আভিজাত্যের যে-ছবি পাওয়া যায়, তা তিনি অভিজাতের মতোই ঠাণ্ডা মেজাজে দেখেছেন ও এঁকেছেন। সর্বনাশ যে আসন্ন—এমনকি উপস্থিত—এ-বিষয়ে সকলেই সচেতন; আর এই সচেতনতার ফলে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপই হয়েছে এ-যুগের কবিতার প্রধান দুটি সুর। কিন্তু এই সর্বনাশই যে নবীন সমাজকে প্রসব করবে, এই বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে এমনই জ্বলন্ত যে তিনি ব্যঙ্গনিপুণ হ'য়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ দিয়েছে তা আশার উল্লাস।

> তবু জানি ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
> যুগে-যুগে নতুন জন্ম আনে
> তবু জানি—
> জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে ভস্ম হবে
> আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। ('ঘরে-বাইরে'—সমর সেন)

এই বিশ্বাসে 'পদাতিক' আগাগোড়া উদ্দীপিত; তার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক কাব্যের নৈরাশ্য থেকে বেঁচে গিয়েছেন। সাম্যবাদই মানবজাতির ধ্রুব বা ঈপ্সিত লক্ষ্য কিনা সে-বিষয়ে তর্ক তুলবো না এখানে; ধ'রে নেয়া যাক যে কাব্যে বিশ্বাসের মূল্য নৈতিক নয়, শিল্পগত। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কবি জীবনকে বিশেষ-একটি ভঙ্গিতে ছাখেন ব'লে তাঁর বাক্যগুলি রসাত্মক কিংবা আবেগবাহী হ'য়ে উঠতে পারে সহজে, এবং শিল্পের সংক্রমণ-ক্ষমতা প্রবল ব'লে তখনকার মতো নাস্তিক পাঠকের মনেও সে-বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়—বিশ্বাসী কবির এই পর্যন্ত লাভ। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী পাঠকের পক্ষে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগের কোনো বাধা না থাকে, তাহ'লে সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকের পক্ষেও 'পদাতিক' উপভোগ্য হ'তে পারে না তা নয়।

বিশ্বাস যেখানে প্রবল, প্রকাশের ঝোঁক সেখানে সরলতার দিকে। 'পদাতিক' খুলে প্রথমেই পড়ি:

> প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
> ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
> চোখে আজ স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
> কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া ('মে-দিনের কবিতা')

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে।...
আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে,
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে। ('সকলের গান')

এ-সব চটুল ছন্দ শুনিয়েই সত্যেন্দ্র দত্ত একদা আমাদের মন মজিয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষের এ-ধরনের রচনাগুলিতে একটি lilt আছে যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এ-সব ছন্দ প্রায়ই এলিয়ে পড়তে চায়, একঘেয়েমির দুর্মূল্যে এদের মধুরতা কিনতে হয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে যুক্তাক্ষর ছড়িয়ে সুভাষ এদের বাঁচিয়েছেন। এ-কবিতা দুটি আমার নিজের খুব পছন্দ নয়, কিন্তু এ-দুটি প'ড়ে মনে হয় যে 'জনগণের কবি' হবার প্রায় সমস্ত উপাদান এই তরুণ কবির আছে। অতীতের যে-সব কবির সঙ্গে পাঠকসমাজের যোগ ছিলো প্রত্যক্ষ, তাঁদের কথনভঙ্গিতে একটি অকুণ্ঠিত ঋজুতা পাওয়া যায়, কেননা সাধারণ লোক নিয়ে গঠিত একটি শ্রোতৃমণ্ডল মনের সামনে রেখেই তাঁরা লিখতেন। কবিতাকে বক্তৃতা বা কথকতার কাজে লাগাতে তাই তাঁদের লজ্জা ছিলো না, বরং আনন্দ ছিলো। শ-র 'ক্যাণ্ডিডা' নাটকের কবি যখন বলেন, 'All poets speak to themselves, the world only overhears,' তখন আধুনিক সমাজে কবির অবস্থার বর্ণনা করেন তিনি; কিন্তু যে-সমাজে কবির শ্রোতা ছিলো জনসাধারণ, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নয়, সে-সমাজে কবি নিজের মনে গুনগুন করতেন না, বেশ চেঁচিয়ে সকলের শোনবার মতো ক'রেই কথা বলতেন।

'পদাতিকে'র অনেক কবিতায় এই উচ্চস্বর, এই বক্তৃতার ঢং ধরা পড়ে। দ্রুত ছন্দে, সহজ কথ্যভাষায় কোনোরকম ঘোরপ্যাচ না-ক'রে বক্তব্যটিকে একেবারে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য :

সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছনে ফেলে,
সব চেয়ে দ্রুত ট্রেনে ক'রে আজ
এখানে আসা
—আসানসোলে। ('আসানসোলে')

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সারি সব
চিমনি চূড়ো।

ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শান
শুনেছে নাকি
কামারশালে? ('এখানে')

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও…
দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা, বন্যার ঢেউ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই। (চীন: ১৯৩৮)

নিছক কান দিয়ে শুনলে এ-সব কবিতা ভালো লাগবে; এদের আগাগোড়াই—এমনকি জাপানি বোমাবর্ষণের বর্ণনাতেও—শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার—এমনকি বেপরোয়া ফূর্তির—সুর; এ যেন বৃহৎ জনসভায়, বা 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা ব'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি; যে-ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি তার সুমিতি।

তবু, বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কবিতায় জনপ্রিয়তার গুণ থাকা এতই দুরূহ যে চড়া গলা শুনলেই আমাদের সন্দেহ জাগে। নজরুলের উচ্চস্বরকে শেষ পর্যন্ত ভাবালুতায় অধঃপতিত হ'তে তো দেখলুম। সংবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে ফিরতেই হয় স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে, জটিল কলাকৌশলে, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায়, যদি তিনি কবি হিশেবে নিজের পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনা করেন।

'জনগণের কবি' হ'তে যাওয়ার এই বিপদ সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনবহিত নন। 'পদাতিকে' রয়েছে সরলতার পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসংকোচ, উচ্চ ঘোষণার পাশে-পাশে ব্যঙ্গের চাতুরী, ধ্বনির বিচ্ছুরিত আভা। সমসাময়িক অনেক কবির কাছেই তিনি পাঠ নিয়েছেন—বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে—কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারো অক্ষরের উপর মক্শো-করা নয়; এত অল্প বয়সে যে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।

২

বিশিষ্ট কলাকৌশলের যিনি অধিকারী তাঁর কাব্যচর্চা দুই কারণে সার্থক, কেননা তিনি যে শুধু নিজে ভালো কবিতা লেখেন তা নয়, নিজের ভাষার সমগ্র

কাব্যকলাতেই অন্তত অল্প একটু পরিবর্তন ঘটান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-অভিনবত্বের কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি তা তাঁর কাব্যে সবচেয়ে গৌণ জিনিশ, কারণ বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য দায়ী কবি নিজে নন, দায়ী তাঁর সামাজিক পরিবেশ। প্রসঙ্গের সরসতা পারদধর্মী; বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘন-ঘন ওঠা-নামা করে যে শুধু বিষয়বস্তু নিয়েই কথা হ'লে এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগে প্রায়ই পড়া যেতো না। উদাহরণত, অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে সাম্যবাদেই যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিষয়, কেননা, সেটা আর প্রার্থনীয় থাকবে না, হ'য়ে উঠবে নিতান্ত বাস্তব। কালসংকটে যে-কোনো একটি সমাধানের ইঙ্গিতে অনেক পাঠকেরই মন নেচে ওঠে, কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারণে। অনেক সময় কোনো ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে আমরা এও ভুলে যাই যে বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয় না, কলাকৌশলই শব্দসমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে, এবং কলাকৌশল বিষয়নিরপেক্ষ। শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতার—বা যে-কোনো শিল্পের—বিচার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে; কেননা শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে তা নয়, উপরন্তু একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনো পাঠকের চোখে দূষ্য। এই কারণে কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে শুধু বিষয়ের জন্য আমি আজ 'পদাতিকে'র প্রশংসা করতে বসিনি। যে-বিশ্বাসের কথা আগে বলেছি তা এই তরুণ কবির রচনায় শুধু সদিচ্ছা বা শুকনো নীতির রূপে প্রকাশ পায়নি, তাতে তিনি সরসতার সঞ্চার করতে পেরেছেন। তার উপর কলাকৌশলেও নৈপুণ্য লক্ষণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত, ছন্দ নিয়ে এই ৩২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানারকম পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন; নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে তাঁর এই ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহ'লে বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনো পরিণতি তাঁর কাছে আশা করা অন্যায় হয় না।

তিন মাত্রা ও পয়ার, দু-রকম ছন্দেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওস্তাদ। পয়ারে তাঁর হসন্ত শব্দের ব্যবহার আমার রীতিমতো আশ্চর্য লেগেছে। পয়ারে যুক্তবর্ণকে আমার একমাত্রা ধরি, কিন্তু হসন্তের পরে স্বরান্ত শব্দকে আলাদা মূল্য দিয়ে থাকি, এই নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, 'কল্কিতে' কথাটি নিঃসন্দেহে তিন মাত্রা হ'লেও 'কলকাতা' সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান, 'জল নিতে' লিখতে গেলে তাকে চার মাত্রার মূল্য না-দিয়ে উপায় থাকে না। হসন্তের পূর্বের স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে বলবার যে-নিয়ম বাঙালির উচ্চারণে মজ্জাগত, তার সাহায্যেই এ-অসংগতি মানিয়ে যায়, এবং ভেবে

দেখতে গেলে এই নিয়মের উপরেই পয়ারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উচ্চারণের স্বাভাবিক ঝোঁক বিকৃত না-ক'রেও পয়ারে হসন্তের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার সম্ভব। কয়েক বছর আগে পদ্যে একটি নাটিকা লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' কথাটা অনায়াসে তিন মাত্রায় জায়গা পায়—

দেখা দিলো কলকাতার আরো-এক কাল

এই পংক্তি স্বচ্ছন্দে পয়ারে স্থান পেতে পারে। বলা যায়, 'কলকাতার' শব্দটির 'ল' ও 'কা' অদৃশ্য, কিন্তু শ্রুতিগম্য যুক্তবর্ণ রচনা করেছে, এবং পংক্তিটি হঠাৎ যদি খটকা লাগায় তার কারণ এই যে ছন্দ পড়বার সময় আমাদের চোখের অভ্যাসকে ভুলতে পারি না। তারপর থেকে এ-ধরনের পরীক্ষা এখানে-ওখানে করেছি, কিন্তু প্রথা-পথ থেকে বেশি দূরে সরতে সাহস পাইনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তীদের অনুশাসন ভ্রূক্ষেপমাত্র না-ক'রে হসন্তের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন: হসন্তকে কখনো দিয়েছেন একমাত্রার গৌরব, কখনো বা পাশের স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে দিয়েছেন এঁটে: ফলে তাঁর পয়ারে চলাফেরার একটি নতুন রকমের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। বিশেষত, বাক্যগুলিকে গদ্যের ছাঁচে ঢালাই করতে, ও বিদ্রূপ জমাতে, এ-কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। ২৩ পৃষ্ঠায় 'অতঃপর' নামে যে-গদ্যাকৃতি কবিতাটি রয়েছে, তার তর্কাতীত সাফল্যের মূলে এই কৌশলই রয়েছে:

অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুই তিন সনে
বিপদ একাকী নয়কো!...
দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম।

এতৎসত্ত্বেও হয়তো...
আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার?
ধনীদের তো পোয়া বারো
বিশেষত,—ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধি। ('অতঃপর')
গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে।...
বসন্ত সত্যই আসবে? কী দরকার এসে? ('আলাপ')
অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে ('আলাপ')

এই পংক্তিগুলিতে 'খাজনা', 'নয়কো', 'হাত-পা', 'আসবে', অনেকদিন' 'খিদিরপুর' 'গোলদীঘির' 'কী দরকার' 'ধনীদের তো' 'ভারতবর্ষে' 'একচেটিয়া' কথাগুলি লক্ষণীয়। হসন্ত গেঁথে দেয়া হয়েছে পরবর্তী স্বরের সঙ্গে, শুনতে খারাপ তো হয়ইনি, বরং মুখের কথার মতোই অবাধ গতিতে

বিদ্রূপ হয়েছে ধারালো। 'হাত-পা সব হিম', 'ধনীদের তো পোয়া বারো', 'ভারতবর্ষে একচেটিয়া' এ-ক'টি সংযোগ খুবই দুঃসাহসী ও মৌলিক,—কোনো-না-কোনো তরফ থেকে আপত্তি না-উঠলে অবাক হবো। কিন্তু, 'ধনীদের পোয়া বারো', 'দুশ্চিন্তায় আমাদের হস্তপদ হিম', 'বিশেষত এ-ভারতে একচেটে নেতা গান্ধি' এ-রকম লিখলে গতানুগতিকের মনরক্ষা হ'তো, কিন্তু কবিতার মানরক্ষা হ'তো কি?

এ-রকম উদাহরণ আরো পাওয়া যাবে—

> ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা…
>
> নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি…
>
> হাজরা পার্কে সভা কাল…
>
> শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন-দিবস; লাল-পাগড়ি মোতায়েন

কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা চলে না কবির মনোযোগ হসন্তের সংশ্লেষণেই আবদ্ধ, বিশ্লিষ্ট ব্যবহারেও তিনি অকুণ্ঠিত।

> বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ
> মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না…

এখানে 'প্রত্যহ' আর 'লাগবে না' চার মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মোটের উপর, হসন্তের উভয় রীতি নিপুণভাবে মিশিয়ে এই তরুণ কবি পয়ারের এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছেন।

তিন মাত্রার ছন্দ আঁটোসাটো, নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা, তাকে খেলানো শক্ত, কিন্তু এ-যন্ত্রেও সুভাষ তাঁর নিজের একটি সুর লাগিয়েছেন। নিপুণ কারিগরি ধরা পড়েছে তিনমাত্রায় যুগ্মস্বরের ব্যবহারে, তাছাড়া পংক্তিপ্রান্তিক যুক্তবর্ণে, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেননি :

> রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি।
> চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি;
> হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
> ম্লান হ'য়ে যায় সব-হারাদের বস্তি। ('রোমান্টিক')
>
> কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
> টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
> দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি? ('বিরোধ')
>
> গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
> পুরোনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
> দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
> গ্যাসের আলো-জ্বলা এ দিনশেষে। ('বধূ')

এ-সব কবিতা যে মিলবর্জিত তা কানে বোঝা যায় না, চোখের সাহায্য নিলে তবে ধরা পড়ে। ছন্দের গতিই এমন যে মিলের কাজ আপনিই সম্পন্ন হচ্ছে, এমন কোনো অভাব নেই যা মিল পূরণ করতে পারতো।

৩১ পৃষ্ঠায় 'কিংবদন্তী' নামে আট লাইনের যে-পদ্য আছে তার ছন্দের প্রতি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

চলছিলো এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার।

এখানে তিন মাত্রার ছন্দকে পুরো বারো মাত্রা না-ক'রে এগারো মাত্রায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, শেষের কথাটা তাই একটু টেনে পড়বার ঝোঁক হয়, তাছাড়া হসন্ত শব্দ বেশি আছে ব'লে বেশ একটা দ্রুত রকমের দোলা জেগেছে।

এ-ছন্দের জাত অবশ্য নতুন নয়, এগারো মাত্রাও অভিনব নয়, এ-বইয়েরই ২৮ পৃষ্ঠায় এর আর-একটি উদাহরণ রয়েছে, যা অতি পরিচিত :

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি মিতে,
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে ;
বার-বার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে। ('ধাঁধা')

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হসন্ত শব্দের আধিক্যের জন্যই 'কিংবদন্তী'র সুরটা হয়েছে আলাদা, আমার কানে তো নতুন শোনালো।

৩

'পদাতিকে'র প্রায় সব কবিতাই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'বধূ' ও 'প্রস্তাব'। এ-দুটিতে ব্যঙ্গের লঘুতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আবেগ, কোথাও মাত্রা ছাড়ায়নি, কোথাও উপচে পড়েনি, এক মানস-রসায়নের ফলে দু-ই হয়েছে রূপান্তরিত।

শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।
চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান। ('প্রস্তাব')

ঠাট্টাটা এমন যে আমরা যারা কোকিলের দিকেই কান ফেরাবার পক্ষপাতী, তাদের পক্ষেও বিস্বাদ নয়। 'বধূ'তে আছে সরল গ্রাম্য জীবনের আর আধুনিক নগরজীবনের প্রতিতুলনা। দুটি সুরই একসঙ্গে বাজছে ; মধুরের

সঙ্গে রূঢ়কে, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে কৌশলে জড়ানো হয়েছে ব'লে পদে-পদে অপ্রত্যাশিতের চমক লাগছে; কবিতাটির সম্পূর্ণ ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হ'লে অন্তত দু-বার পড়তে হয়।

সারা দুপুর দিঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া,

প'ড়ে মনটা বিশেষ একটি সুরে বাঁধা হয়, বিশেষ একরকমের প্রত্যাশা জাগে, কিন্তু সে-প্রত্যাশা চূর্ণ হয় তার পরেই যখন পড়ি:

ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।

এটা sublime থেকে ridiculous-এ আসবার দৃষ্টান্ত নয়, দুই বিপরীত জগতের সংঘাত ঘটিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করা হ'লো।

ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।

গ্রামের 'খাসা জীবন' ছাড়তে হ'লো, এদিকে শহরও নির্মম, নিঃস্পৃহ:

বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো।

ঠাট্টার সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘশ্বাস, স্পষ্ট শোনা গেলো।

একটা কথা বলা দরকার। এ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'কে ব্যঙ্গ করা হয়নি, তাকে বিশ-শতকী জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিষয় এক, নামও এক, রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে, তবু—কিংবা সেইজন্যই—এটি সত্যিকার মৌলিক রচনা হ'তে পেরেছে। এই কবিতাটিকে বলতে ইচ্ছে করে মাস্টারপীস, অন্তত এটি যে একটি 'tour de force', সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য একটি 'tour de force' 'অতঃপর' কবিতাটি। এর ছন্দের কথা আগেই বলেছি; এর বিষয় ভারতের ইতিহাসের পালাবদল; কথা খরচ হয়েছে কম, অথচ সব কথাই আছে। জমিদারি ও মহাজনিতে আয় ক'মে যাচ্ছে, তার উপর—

বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশ বিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অপ্রিয়—
পৈতৃক বন্যাও চলে।

কিন্তু তবু আশা আছে :

> ...মহাশয়,—জমিদারি যায় যাক। বণিকের মৌলিক প্রতিভা
> দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

বিষয়টিতে নূতনত্ব নেই—কবিতায় তা থাকা বোধহয় উচিতও নয়—কিন্তু নূতনত্ব আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথনভঙ্গিতে, তাঁর সংকোচনের ক্ষমতায়। এই বিষয়েই আরো দু-একটি কবিতা পাওয়া যাবে 'পদাতিকে'; সাময়িক প্রসঙ্গকে, এমনকি সংবাদপত্রের তথ্যকে আবেগের তাপে গালিয়ে নিয়ে সুভাষ তাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।

> 'নিষিদ্ধ খনির গর্তে* লালকোর্তা সূর্যের বাবতা' ('দলভুক্ত')

আবার

> বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ। ('নির্বাচনিক')
> বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উলঙ্গ স্বপ্নে অশরীরী। ('নির্বাচনিক')

কিংবা

> তম্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়। ('পদাতিক')

এমনও নয় যে এই তরুণ কবি বেঁকিয়ে ছাড়া কথা বলতে শেখেননি। মাঝে-মাঝে এমন এক-একটি ছবি তিনি তুলে ধরেছেন যা এমনকি জীবনানন্দ দাশকে মনে করিয়ে দেয়, যাঁর সঙ্গে এঁর সব বিষয়েই দুস্তর ব্যবধান।

> সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
> মনের হরিণ সোনা হ'লো কার নয়নে,
> নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
> নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ! ('বিরোধ')
>
> চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
> হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী। ('পদাতিক')

অপরাহ্ণের এই 'নদী'টিকে আমরা সহজে ভুলবো না।

৪

১৫ পৃষ্ঠায় কবি কিছুটা সরল ও গদ্যময়ভাবে ঘোষণা করেছেন : 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ।' আর শেষ কবিতার শেষ পংক্তি দুটিতে :

---

* ছাপার অক্ষরে যদিও 'গর্তে' আছে, আমার মনে হ'লো এখানে 'গর্তে' না-হওয়া সম্ভব নয়, সুভাষ 'গর্তে' লিখতেই চেয়েছিলেন—অন্তত, তা-ই উচিত ছিলো।

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমারে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই।

অতএব তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। কবিত্বশক্তিও তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ। তবু, এখানে আরম্ভ মাত্র। 'পদাতিকে' দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি: প্রথমে, সরল, চড়া গলার কবিতা, যা 'জনপ্রিয়' হবার দাবি রাখে, অন্য দিকে জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু-দিক বজায় রাখা চলবে না, এক দিক ছাড়তে হবে। যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিশেবেই, কবি হিশেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হ'তে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?

১৯৪০

অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া

বিস্ময়কর বই, খুলে পড়তে বসলে পাতায়-পাতায় মন চমকে ওঠে। বাংলা কবিতার পাঠকের কানের ও মনের যতগুলো অভ্যেস আছে, তার একটাও প্রশ্রয় পায় না, বরং প্রহৃত হয়। কিছুরই সঙ্গে এ-কাব্য মেলে না, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-র মতো 'দুরূহ' কবির পাঠাভ্যাসও বিশেষ কাজে লাগে না এখানে। এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব। বলতে ইচ্ছে হয়, উগ্র রকমের আধুনিক। ঠাট্টা করতে লোভ হয়। কিন্তু দু চারটি কবিতা পড়তে-পড়তে উপহাসের ঝোঁকটা লজ্জিত ও পরাস্ত হয়, বিস্মিত মন সানন্দে স্বীকার করে যে এখানে প্রকৃত কবিত্বশক্তির সাক্ষাৎ পেলুম।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ অন্যান্য কবিদের মধ্যে কতগুলি মুদ্রাদোষের সৃষ্টি করেছিলো। পঁচিশ বছর আগেকার বাঙালি কবিরা শিথিল ও তরল হওয়াটাকেই গৌরবের মনে করতেন; অকারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, প্রকৃতি-বর্ণনার বাড়াবাড়ি, ছন্দ-মিলের অতিপ্রকট চাতুর্য, এ-সব জিনিশেরই তখন বাজার-দর ছিলো চড়া। সর্বোপরি, কবিরা তখন ছিলেন ভুল অর্থে আত্ম-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ যে-বিষয় নিয়ে লিখছেন তার দিকে লক্ষ্য না-রেখে নিজের দিকে তাকিয়ে লেখাই তাঁদের অভ্যেস ছিলো। সুতরাং তাঁদের উৎকৃষ্ট রচনাও ভাববিলাসের উচ্ছ্বাস ছাড়িয়ে বেশি দূর উঠতে পারেনি, যদি বা কখনো ক্ষীণ কিছু বক্তব্য থাকতো, অজস্র ব্যঞ্জনাহীন কথার চাপে তা দম আটকে মারা যেতো কয়েক পংক্তির মধ্যেই।

এই সহজ, অতি সহজ বাক্যচ্ছটার বিরুদ্ধেই আধুনিক কবির উদ্যোগ। কিছুকাল পূর্বে বাংলা কাব্যে যে-অস্থিহীন নমনীয়তা পরিব্যাপ্ত ছিলো তা থেকে আমাদের কবিরা যে আজ মুক্ত, এ-কথা উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করা বেশি শক্ত নয়। তার গায়ে আজ হাড়মাংস গজিয়েছে, তার রক্ত বইছে দ্রুত তালে। অকারণ বাক্যভার আর নেই, নিজেকে অতিক্রম ক'রে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখবার চেষ্টা আজ সুস্পষ্ট। ছন্দে তরলতার চেয়ে দৃঢ়তাই বেশি, মিষ্টি-মিষ্টি টুংটাং-এর বদলে গূঢ় ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির দিকে ঝোঁক পড়েছে। অনুপ্রাসাদি অলংকার যখন এসে পড়ে, তখন দেখতে পাই সেগুলিকে অপ্রধান, এমনকি, প্রচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা।

এই লক্ষণগুলি সবই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বর্তমান। কিছুটা চড়া মাত্রাতেই বর্তমান। কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর কাব্য দুঃসাহসিক। কিন্তু দুঃসাহসিক হবার অধিকারও তাঁর আছে। তিনি অভিনব, কিন্তু অভিনব

হবার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়েই তিনি আসরে এসেছেন। তাঁর ছন্দের বিচিত্র তির্যক গতি, অদ্ভুত শব্দযোজনা, দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব—সমস্তই নিবিড় মননশক্তির ফল। এর ফলে অবশ্য তাঁর কাব্য কিছুটা আত্মসচেতন হ'য়ে পড়েছে; কিন্তু আজকের দিনের কাব্যে আত্মবিস্মৃতির প্রগল্‌ভতার চাইতে আত্মসচেতনতার দুরূহতাই বরেণ্য।

অমিয় চক্রবর্তীর মন পুরোপুরি আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বহির্মুখী। আমাদের কবিতায় বিদেশের আবহাওয়া বিরল, যদিও মধুসূদন থেকে আরম্ভ ক'রে বহু বাঙালি কবি বিদেশে ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানে ব'সে কবিতাও লিখেছেন। 'খসড়া'র প্রথম দিকের দু-একটি কবিতায় য়োরোপগামী জাহাজের বিদেশী আবহময় ছবি পেয়ে খুশি হলাম। লাহোরের ও কলকাতার কয়েকটি ছবিও অনধিক ইঙ্গিতে জীবন্ত। নিজের সুখদুঃখের কথা না-ব'লে তিনি যে বিচিত্র বহির্জগতের কথা বলেছেন, তা পাঠকের পক্ষে মুখ-বদলানো হিশেবে স্বাদু তো নিশ্চয়ই, তাছাড়া আধুনিক বাঙালি কবির পক্ষে কৃতিত্বও বলতে হবে। অল্প কথায় গতিশীল ও রঙিন ছবি ফোটাতে তিনি দক্ষ:

> পাহাড় দ্বীপের সারি রাঙা-ছাত বাড়ি—
>
> রঙের মাছের স্বপ্ন সচল, নৌকোতলায়—
> রেলের স্টেশন, সবুজ আলো, ঘুমহারা জানলায়

এ-সব পংক্তির সংহতি উপভোগ্য। তাঁর বর্ণনার উপাদানগুলি তথ্যধর্মী, স্পর্শসহ:

> পঞ্জাবে, পাঁচই মাঘে, রং নিয়ে ওপাশের ছাতে
> বিকেলের মূর্তি এল সেলাম জানাতে।
>
> দিগন্ত-দেয়াল বেয়ে সূর্য ওঠে,
> রাত্রি হয়।
>
> বৃষ্টি পড়ে
> ছাতা-অলা গলির ভিতরে।
>
> রাত্রে মাস্তুলে মেঘে ছিন্ন চাঁদ ঝোলে।

উপরন্তু, তাঁর কাব্যের সমস্ত উপমা ও রূপক আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তাঁর কল্পনার পরিভাষা বিশেষভাবেই এ-যুগের। 'সমুদ্র' কবিতাটি এর ভালো দৃষ্টান্ত:

নীল জল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে পড়া। শব্দের ভিড়ে
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিখুঁত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে

দ্বীপ ভাঙে, পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নুনযন্ত্রে
ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী
ঐটুকু। আকাশের কারখানা ঢাকা-ডাইনামো,
শব্দ নেই। রাত্রে বারান্দায় ভাবি সমুদ্র কখন হবে শম।

যদি কেউ বলেন, সমুদ্রকে কারখানা হিশেবে কল্পনা করায় বাহাদুরি কিছুই নেই, সে-কথা মেনে নিয়েই বলবো যে 'বাহাদুরি' দেখানো কবির কাজ নয়। সমসাময়িক জীবনকে প্রকাশ করার পক্ষে সমসাময়িক উপকরণ স্পষ্টতই বেশি উপযোগী। তাছাড়া এও মানতে হবে যে কিঞ্চিৎ ক্যাটালগের ভাব সত্ত্বেও পংক্তিগুলির ভাঙা ছন্দের ওঠা-পড়ায় সমুদ্রের কম্পন ও আলোড়নের আভাস এসেছে।

মনে হয়, 'খসড়া' প্রকাশের পরে অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অন্যতম ব'লে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। তিনি যে আধুনিক, এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ, আর সেদিক থেকে বইয়ের শেষের দিকে তত্ত্বধর্মী বচনা ক-টি আমার ভালো লাগলো না। মনের মধ্যে জীবনের চলতি ছবি প্রতিফলিত করাতেই এই কবির শক্তির স্বকীয়তা, সত্যসুন্দরের তত্ত্বকথার ক্ষেত্রে তিনি যেন কুয়াশায় দিশেহারা হ'য়ে পড়েন। কলাকৌশলের দিকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর, সেদিকে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে, সমকালীন বাঙালি কবিরাও হয়তো কিছু সাহায্য করেছেন। ভাঙা পয়ারই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, পদ্যের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ ক'রে তিনি আনন্দ পান, যখন তিনি গদ্যে কবিতা লেখেন, সে-গদ্য পদ্যের ধ্বনিকে দখল করতে সচেষ্ট হয়। যেমন, 'বহুকালের ঘড়ি':

অন্ধকারে উঠে দেখি হাত-ঘড়ি
হাতে নয়, খোলা আকাশে।
রেডিয়ম-জ্বালা সময়
দপদপ করচে শূন্য জুড়ি',
চোখ নামাই।
লক্ষ তারায় তৈরি ঘড়ি
কটা বেজেচে ?

এর ছাঁচটা গদ্যের, কিন্তু 'জুড়ি'-র মতো কেবল পদ্যে ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এতে মনে হয় তাঁর আসল ঝোঁকটা পদ্যেরই দিকে, গদ্যভঙ্গির আপেক্ষিক উদারতায় পদ্যকে মুক্তি দিতেই তিনি প্রয়াসী।

> বেড়া পার হল, পা, চলো।
> সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
> গাছের আড়ালে, বলো
> কে স্থির দাঁড়িয়ে—
> আলো নিয়ে।
> ফিরে আসার সাঁঝ। ('ঘর')

একে গদ্য বলবো না পদ্য, সে-বিষয়ে মনস্থির করা সহজ নয়; 'সাঁঝ', 'সতত' গোছের শব্দ মাঝে-মাঝে খটকা লাগায়; তবু মোটের উপর বলা যায় যে এ যদি ছন্দ নিয়েই পরীক্ষা হয়, তবে এ-পরীক্ষা সার্থক হয়েছে। আর সার্থক হয়েছে ব'লেই মনে হয় যে এ-পরীক্ষার প্রয়োজন ছিলো: যেন কবিতায় ব্যবহার্য বাংলা ভাষার একটি নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত হ'লো এ-সব রচনায়। আরো লক্ষণীয় এই যে মিলগুলো প্রায়ই প্রচ্ছন্ন; তার উপর মিলের বদলে স্বরানুপ্রাসের ব্যবহার আছে। নিয়মিত ছন্দ ও মিল ইচ্ছে ক'রেই কবি এড়িয়ে চলেছেন; ও-সব যে তাঁর আয়ত্তেরই মধ্যে তারও প্রমাণ তর্কাতীত:

> স্বদেশী শিবিরে আছে শত্রু তব ধুলো
> দরজা, মলিন পর্দা, কুলি-টানা পাখা,
> ভিস্তি-বওয়া জল, ঝাঁটা, বহুর বেদনারক্তমাখা
> জমিদারি মঞ্চে রাখা
> দুর্লভ আরাম। আর বৃষ্টির প্রার্থনা,
> কৃপালোভী ভিড়ের সান্ত্বনা। ('মর্মান্তিক')

কিন্তু এ-ধরনের রচনা সংখ্যায় খুব কম। ভাষা ও ছন্দ নিয়ে নতুন সৃষ্টির পরীক্ষাতেই তিনি বেশি ব্যাপৃত, তাঁর বিশেষত্বও সেখানে।

বইখানার নাম 'খসড়া'; কিন্তু আসলে তা খসড়ার চেয়ে কিছু বেশি, কেননা বক্তব্য ও বাচনভঙ্গির সমন্বয়ে এর অধিকাংশ কবিতাই উজ্জ্বল। তবু আশা করি তাঁর ছন্দের পরীক্ষায় আরো কিছু দূরে, এবং নির্দিষ্ট কোনো স্তরে, কবি পৌঁছবেন। শেষ কবিতাটির শেষ পংক্তিতে তিনি আশা দিয়েছেন, 'শেষ হয়নি কবিতা। বইএর শেষ।' অতএব তাঁর আরো কবিতার জন্য আমাদের উৎসুকতা অসংগত নয়।

১৯৩৮

অমিয় চক্রবর্তী : এক মুঠো

এক বছরের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি প্রীতিকর। এই অল্প সময়ের মধ্যে আর-একটি বই হবার মতো রচনা যাঁর কলম থেকে বেরোতে পারে তিনি যে কবিতার কারুশিল্পে নিরন্তর পরিশ্রমী সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না, এবং তাঁর মগজের কারখানা যে সর্বদাই সক্রিয়, সুদ্ধ এই কারণে তাঁকে তারিফ করতে ইচ্ছে করে। তাঁর প্রথম গ্রন্থে যে-সব দুঃসাহসী পরীক্ষা তিনি শুরু করেছিলেন, এখানে দেখছি তার দ্বিতীয় অধ্যায়, যদিও নিছক কৃতিত্বের বিচারে 'এক মুঠো' 'খসড়া'কে অতিক্রম করে না। এ-বইখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো, দেখতে মনোরম, আর নামটিও চমৎকার মানিয়েছে। কবিতা-গুলি বেশির ভাগ 'খসড়া'য় প্রবর্তিত অভিনব গদ্য-ছন্দে লেখা, যাত গদ্য প্রায়ই ছন্দের ধ্বনিকে ব্যঞ্জনাপ্ত করে, লুকোনো আর বিচিত্র মিল থেকে-থেকে পাঠককে চমকে দেয়। ছন্দে তিনি দক্ষ, তবু ছন্দকে পরিহার ক'রে তিনি কবিতার ভাষা ও রূপকল্প নিয়ে যে-পরীক্ষায় লিপ্ত আছেন, তার ক্রম-বিকাশ সাধারণ পাঠক না হোক, অন্তত অন্যান্য কবিরা গভীর কৌতূহল নিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন।

অমিয় চক্রবর্তীর আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনি প্রকৃতই সর্বদেশীয়। নতুন বিচিত্র ভূগোলের অভাবিত রস পরিবেশন করেছেন তিনি। 'খসড়া'তে এর উদাহরণের অভাব নেই, এরোপ্লেনে ওড়ার কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

> ঝোড়ো কাচে
> জর্মানির উপর-হাওয়ায়
> ভূমির ছবির ঘূর্ণি
> এরোপ্লেনে
> প্রাগ থেকে উড়ছি ড্রেসডেনে
> নীচে দেখা যায় না পৃথিবী ঢেকে আছে
> ওঠে শূন্য চূর্ণি

বিরতিচিহ্নহীন ছোটো-ছোটো পংক্তিতে এরোপ্লেন-থেকে-দেখা গতিশীল পৃথিবীর ছবি ধরা পড়লো। আর আকাশে ব'সে বিদেশের এলবে অরণ্য আর নিজের দেশের দিঘির পাড় মৃন্ময়ী বাড়িতে ভেদ মুছে যায়, কবির এ-অনুভূতিও পাঠকের মনে সংক্রমিত হয়। তাঁর অনুভূতির ব্যাপ্তি

আন্তর্দেশিক,* এমনকি আন্তর্জাগতিক। মঙ্গলগ্রহে ব'সে তিনি পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জল্পনা করছেন :

> আছি এখন মার্স-এ। দেউলে লাল বাতি জ্বালা।
> মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।
> দূরে শনির সোনার থালা;
> নির্বাণপথের শূন্য।
> এখানে কই
> রেফ্রিজরেটরের দই।

এই আন্তর্জাতিকতার—কিংবা আন্তর্জাগতিকতার—ঝোঁক কখনো আবার তাঁর রচনাকে ফিরিস্তির স্তরে নামিয়ে দেয়, যেমন—

> ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। তাতে গোরেরিং ফরাসী লাইন গঙ্গাফড়িং বড়োবাজার,
> হাতির পা, ধর্মযাজক, উত্যক্ত বৃদ্ধ, ওয়ারস, বর্নর্ড্ শ, বর্মার হাজার
> চুরোট, খুন, প্রহ্লাদ, জহ্লাদ, চাকরির দ্বন্দ্ব, হিন্দু মুসলিম, নির্বিকল্প সমাধি
> ব্যাধি ইত্যাদি হরেক প্রকার। ('যুদ্ধের খবর')

বর্তমান জগতের, বাংলা খবর-কাগজের ভাষায় 'ভীতিকর পরিস্থিতি' বোঝাবার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর উপায় নিশ্চয় এই কবির জানা আছে? তবে সুখের বিষয়, এ-রকম উদাহরণ 'এক মুঠো'য় বিরল। এবং এমনও নয় যে শুধু বিশ্বের সমস্যা নিয়েই তিনি ব্যস্ত। ঘরের কাছাকাছি তিনি যখন চোখ ফেরান তখন তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের প্রতিদিনের অতি-পরিচিত অনেক জিনিশ সুন্দরের দুর্লভতা পায়। আলো-ছায়ার খেলায় তাঁর নৈপুণ্য :

> নদী। ঝলমল ক'রে কে গেল ল্যাম্পপোস্টের ছায়ায়
> কম্পিত বাঁকে। তুমি। ('সেই পথ')

> বিষণ্ণ পুকুরজলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের কালি; ('সংসার')

> নীল টালি গম্বুজের টালি
> গ'লে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিলমিল ('সঙ্গৎ')

শেষোক্ত কবিতায় পশ্চিমের শহরের সবজিমণ্ডির ভিড়ের উত্তপ্ত আবহাওয়া সকলেই চিনতে পারবেন, আর 'আরোগ্য' ও 'চিরাস্থ' এ দুটি কবিতাও বিষয়ের প্রাচীনত্বে ও ভঙ্গির নূতনত্বে উপভোগ্য :

> সেরে-উঠি-উঠি দেহ শোনে
> পাড়ার পৃথিবীর আওয়াজ,
> শব্দের বাণ্ডিল ডোবে মুগ্ধ কানে।...
> তবু স্বাদ ভালো লাগে
> রুটি মাখনের। মাছের ঝোল,
> বিলিতি মাসিক, জ'মে-ওঠা ডাক,
> চোখের, জিভের খোরাক। ('আরোগ্য')

তবে এ-বইয়ের যে-কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো সেটি ঐতিহ্যগত ছন্দে লেখা, এবং তার বিষয় বাঙালি কবির সেই চিরাচরিত বর্ষা। এ-বিষয়টি, আমাদের অন্য অনেক কবির মতো, অমিয় চক্রবর্তীকেও কখনো ক্লান্ত করে না ব'লে মনে হয়; বর্ষা সম্বন্ধে একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লিখতে পেরেছেন, আর তার মধ্যে 'বৃষ্টি'র স্থান সর্বোচ্চে। এতে দৃশ্যমান নূতনত্ব কিছু নেই, কিন্তু আমাদের মনকে এ গভীরভাবে আবিষ্ট করে, আর কবিতার বিষয়ে এইটেই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কথা।

> অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
> বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
> মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
> ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
> শিরায় শিরায় স্নানে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।

এই পংক্তিগুলি অন্ধকার মধ্যদিনে গুনগুন ক'রে আবৃত্তি করার যোগ্য, কারণ এর ছন্দ বৃষ্টিরই ছন্দ। 'খসড়া'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' নামক নতুন ভঙ্গির বর্ষার কবিতার সঙ্গে এ-কবিতাটিকে তুলনা ক'রে পড়লে এ-কথা বোঝা সহজ হয় যে অমিয় চক্রবর্তী ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ ক'রে তবে অগ্রসর হয়েছেন নূতনের প্রবর্তনায়।

১৯৪০

অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল

সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত, আর সেই হিশেবে প্রত্যেক কবিরই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে, কিন্তু আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে 'আধ্যাত্মিক' কথাটা প্রয়োগ করতে চাই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম : ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দর সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য যেমন মেরুপ্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের হৃদ্বরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী। তাঁর যে-কবিতাটি প্রথম সাড়া তুলেছিলো সেটি মনে করা যাক : 'সংগতি', ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার মিলন-সংগীত, এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র। এই 'হাঁ'-য়ের দেশ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যেখানে আমরা কেউ-কেউ দীর্ঘ ভ্রমণেও ঠিকমতো পৌঁছতে পারিনি, কিংবা স্পর্শ ক'রে থাকলেও টি'কে থাকতে পারিনি যেখানে। এটাই তাঁর রচনার প্রেরণা এবং অন্তঃসার : অভাব, প্রশ্ন, তর্ক, বোমা-ভাঙা শহর, বাংলার দারিদ্র্য, মার্কিন সভ্যতা, প্রেমিকার বিচ্ছেদ,—এই সব কণ্টকময় জটিলতা একটি স্থির 'হাঁ'-ধর্মের অন্তর্ভূত হ'য়ে আছে; রক্তবীজের মতো 'না'-য়ের গোষ্ঠী গজিয়ে উঠলেও তারা এক আরো বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সুষমভাবে, বিনীতভাবে অবস্থান লাভ করছে, কোনো দুর্জয় বিরোধের জন্ম দিতে পারছে না। এক দিকে তাঁর স্বভাবের আপতিক বহির্মুখিতা, অন্য দিকে তাঁর আস্থার নৈষ্ঠিকতা—এই দুটি কারণে, অন্যান্য বিষয়ে যতই গরমিল থাক, তাঁর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র। অবশ্য এই সাদৃশ্য অতিশয় সুকুমার, কোনোরকম স্থূল বিচার তার সহ্য হবে না, যেমন দু-জন অনাত্মীয় বা ভিনদেশী মানুষের চেহারায় দৈবাৎ মিল দেখা যায়, কিন্তু নড়াচড়া বা গলার আওয়াজেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। অমিয় চক্রবর্তীর 'মতো' আর একজন বাঙালি কবিকে যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহ'লে আর-একটু দূরে ও পিছনে তাকাতে হবে আমাদের; কলাকৌশলের নূতনত্ব, ভাষার চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, এই সব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর রচনার মধ্যে প্রথিত হ'তে পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি যে তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের অধিবাসী, যে-জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও-কোথাও মিস্টিসিজ্‌ম-এর প্রান্তে এসে পৌঁছয়, বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

২

যদিও 'সংগতি' প্রায় পঁচিশ বছর আগে ছাপা হয়েছিলো, তবু 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' নামক প্রথম বই দুটিতে তাঁকে আমরা অন্য ভাবে পেয়েছিলাম। 'এঁর মন উজ্জ্বল ও সজীব, ইনি বহু ভ্রমণ করেছেন চলতি পথের বৈদেশিক ছবি তীক্ষ্ণ তুলিতে তুলে ধরতে ইনি ওস্তাদ—' তখনকার কোনো পাঠক এই রকম বললে ভুল করতেন না। ব্যতিক্রম ছিলো না তা নয়, কিন্তু মোটের উপর সিনেমা-চঞ্চল চিত্রাবলির জন্যই তাঁর প্রথম পর্যায় স্মরণীয়; এমনকি, ভৌগোলিক আবেদনের দিক থেকে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বর্ণনাপ্রধান কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা হ'তে পারতো। যতদূর মনে পড়ে, 'অভিজ্ঞানবসন্তে' পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিলো; 'দূরযানী'র প্রথম কবিতা, 'হারানো ছড়ানো পাগল'ও তাঁর তৎকালীন ভঙ্গির মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই পরিবর্তন কত দূরস্পর্শী এবং কতখানি আন্তরিক পরিণতির ফল, তা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, যতদিন না 'পারাপার' এবং তারপর 'পালা-বদল' প্রকাশিত হ'লো। 'পারাপারে'র কবিতাবলি অন্তত দশ বছর ভ'রে লেখা; তার পট-ভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, য়োরোপ ও আমেরিকা, তার বিচিত্র সম্পদের মধ্যে কবির মনের অনেকগুলো ঋতু পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। 'পালা-বদল' এক সুরে বাঁধা, কবিতাগুলোর প্রত্যেকটি যেন একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত, বোধহয় সেইজন্যেই এর এই অর্থবহ নামকরণ। কিন্তু আমরা জানি যে পালা-বদল আগেই ঘ'টে গেছে; এবং তার প্রকৃতি বোঝার জন্য এই সাম্প্রতিক গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে পড়া দরকার। 'পড়া দরকার' ব'লেই থামতে পারি না; পড়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাই, কেননা অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা ব'লে আমি মনে করি।

তাঁর কবিতার যে-সব লক্ষণে প্রথমে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেগুলো একেবারে ঝ'রে যায়নি—তা যেতেও পারে না— কিন্তু তার সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে। এখনো পাওয়া যায় অতি নিপুণ বর্ণনা ('সাণ্টা বার্বারা'), একটি মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন তথ্যের তোড়া বাঁধা ('বিধুবাবুর মত', '১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ'), এবং, বারে-বারেই, পৃথিবীর প্রতি, বিশ্বজীবনের প্রতি তাঁর অম্লান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এ-সব কবিতার প্রতি আমার প্রীতি ক্লান্তিহীন, কিন্তু আমি এখানে বিশেষ ক'রে সেই কবিতাবলির উল্লেখ করতে চাই, যেখানে দেখা দিয়েছে বর্ণনার বদলে মনক্রিয়া, আর যেখানে 'পৃথিবীকে ভালোবাসি' এই কথাটা মুখের কথায় বলবার আর প্রয়োজন হয় না। এ-ই তাঁর নূতন সংযোজন—সম্প্রসারণ নয়—এমন একটি কাজ যা তিনি আগে করেননি। যে-বিষয়ে বলছেন, যার 'বর্ণনা' করা হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারি তার সাহায্যে তিনি অন্য কিছু বলতে চাচ্ছেন, (হয়তো কখনো-

কখনো কথাটা ঠিক ধরতেও পারি না, কিন্তু মনীষার কৌতূহল জেগে ওঠে)—সেইজন্য ব্যবহৃত ছবিগুলো শুধু ছবি আর থাকে না, হ'য়ে ওঠে চিত্রকল্প, কোথাও বা প্রতীক। এর সুন্দর উদাহরণ 'বৈদান্তিক', 'বিনিময়', 'ওক্লাহোমা', 'লিরিক' ('পারাপার'), 'পালা-বদলে'র 'অ্যান আর্বর', 'ছবি', 'অতন্দ্রিলা'। বেছে-বেছে কয়েকটি ছোটো কবিতা উল্লেখ করলাম, দশ থেকে কুড়ি লাইনের মধ্যে গ্রথিত, খাঁটি লিরিকধর্মী। শুধু তাই নয়, 'বৈদান্তিক' বাদ দিয়ে এর প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার লেখক হিশেবে অমিয় চক্রবর্তীকে আমরা ভাবিনি এতদিন ভাববার বেশি কারণও তিনি দেননি। অবশ্য তাঁর 'বৃষ্টি' ('কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'), 'চিরদিন' ('আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো') —এ-সব রচনার নির্মল হার্দ্যগুণের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু উল্লিখিত কবিতাবলির মধ্যে নূতন একটি বেদনা প্রবেশ করেছে, 'সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই'-এর মতো শুভ্র বেদনা নয়, তার শান্তির পিছনে রক্তের রং ঝিলিক দেয় যেন, যেমন দিয়েছিলো—অবশেষে—রবীন্দ্রনাথের 'স্তব্ধ রাতে একদিন' কবিতায়। পূর্বে বলেছি অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় রক্তমাংসের সংক্রাম সবচেয়ে কম —এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও 'পবিত্র' তাঁর রচনা: আলোচ্য কবিতাবলিতেও ভালোবাসার দৈহিক উপাদানের নামগন্ধ নেই। আরো বেশি তাদের আসল অভিপ্রায়কেই একটি আস্বচ্ছ আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ব্যাপারটা কী, এবং কতখানি, তা পাঠককেই অনুমান ক'রে নিতে হয় ব'লে অসতর্কের কাছে এদের সংবাদ পৌঁছবে না। স্পষ্টত, দৈহিক সংসর্গে অমিয় চক্রবর্তী দুর্বারভাবে পরাঙ্মুখ, বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গসম্পন্ন কোনো নায়িকাকে একটিবারও দেখা যায়নি সেখানে, দেহটাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে তিনি শুধু ভাবটিকে রেখেছেন, কখনো-কখনো নামও দিয়েছেন তাকে—কিন্তু সে-সব নামও এক রকমের ছদ্মবেশ, যেমন কিনা এই রচনাগুলিও ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতা। এই ধরনের আরো কিছু কবিতা আমার মনে পড়ছে: 'পারাপারে' 'পরিচয়' ('এই দূরত্বের সাঁকো, পাররে বাঁধানো কল্পদেশ'), 'শ্রীমান শ্রীমতী' ('দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখি-ওড়া তীরে'), 'পালা-বদলে' 'মিলন দিগন্ত' (' "কাছাকাছি ফিরে আসা দুজনের বেদনা বাতাসে" ') 'দুই স্বপ্ন' (' "কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে স্বচ্ছ অন্তরাল?" ')—এই সম্পূর্ণ গুচ্ছটিকে আলাদা ক'রে নিয়ে মন দিয়ে পড়লে মানতেই হয় যে বাংলা ভাষার প্রেমের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অমিয় চক্রবর্তীর প্রাপ্য। দেহের প্রসঙ্গে নির্মমভাবে মৌন থেকেও তাঁর বেদনায়—এমনকি তাঁর বাসনায়—কোনো-কোনো রচনা রঙিন হ'য়ে উঠেছে, যার উল্লেখমাত্র নেই তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি, এইখানেই তাঁর

কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া বাংলা ভাষার আর কোনো রচনা আমি জানি না, যেখানে প্রায় কিছুই না-ব'লে অনেক কথা এমনভাবে বলা হ'য়ে গেছে। এবং, রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই, তাঁর এ-সব রচনায় এক রকমের প্রতারক সরলতা বিদ্যমান—আপাতত সহজ, বিশ্রাস্ত, ঈষৎ এলোমেলো, ঈষৎ ঝিমোনো গোছের তাঁর লেখা; যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন হয়, কথাটাকে আমরা অনেক সময় ধরতে পারি না, কিন্তু উপলব্ধির শুভক্ষণে দ্বিগুণ আনন্দ পাই। ভিতরে যে-টান পড়েছে, অবয়বের মধ্যে তা সব সময় থাকে না ব'লেই তাঁর কবিতা বহুবার পঠনসাপেক্ষ।

যদি আমরা বলি যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী, যদি মনোভঙ্গিতে ও রচনাপদ্ধতিতেও এ-দু'জনে মিল খুঁজে পাই, তাহ'লে এই প্রশ্নটা বাকি থেকে যায় যে তিনি কোন অর্থে আধুনিক, কিংবা তিনি কী এনেছেন যা রবীন্দ্রনাথে নেই। এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে এ-দু'জনের জগৎ মূলত এক হ'লেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন, হ্বাইমার, ইয়াসনায়া পল্যানা: এক-একটি সুদৃঢ় আলোকের উৎস, বলতে গেলে সারা জগতের দৃষ্টি যেখানে বিন্যস্ত—যে-পৃথিবীতে ও-রকম স্থায়িত্ব সম্ভব ছিলো সেই পৃথিবী তর্কাতীতভাবে ভেঙে গেছে: আজকের কবি টি. এস. এলিয়ট রাসেল স্কোয়ারের ব্যবসায়ী এবং স্বদেশত্যাগী, রিলকে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ ও লুক্কায়িত; এমনকি জর্মন কুলীন টমাস মান্‌কে একাধিকবার আটলান্টিক পারাপার করতে হয়। বাসা ভেঙে গেছে মানুষের; বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটা একটা আইনঘটিত কল্পনায় পরিণত হয়েছে—এমনকি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'ন্যাশনালিটি' জিনিশটাও তা-ই। এই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তমান পৃথিবী বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী সুতীক্ষ্ণভাবে সচেতন; তাঁর কবিতার পটভূমিকা চার মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে; তাঁর রচনার মধ্যে যে-মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই সে অনবরত ঘুরে বেড়ায় এবং বাসা-বদল করে, অস্থিরতার মধ্যেই অন্তরতম গভীরের দিকে চোখে খুলে রাখে। ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে, অবিরল পথিকবৃত্তির ফাঁকে-ফাঁকে উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠেছে এই রচনাগুলি; কখনো ক্যানসসে, কখনো প্রিন্সটনে, কখনো বস্টনে বা আরিজোনায়, বার-বার যে-'বাসা' বা 'বাড়ি'র খবর পাওয়া যায়, তারা ঐকাহিক ব'লেই উল্লেখযোগ্য। এই জঙ্গমতাবোধ রবীন্দ্রনাথের ছিলো না, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করেনি, তাঁর চেনা জগৎ যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও কাব্যের মধ্যে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এই স্বীকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন

অমিয় চক্রবর্তী—শুধু দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন ব'লে নয়, স্বভাবেরই প্রেরণায় ; রবীন্দ্রনাথে যে-শানাইয়ের সুর কলকাতার গলির অসংগতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলো, তাকে অমিয় চক্রবর্তী প্রয়োগ করেছেন আমাদের সমকালীন পরিচিত পৃথিবীর বিবিধ, বিচিত্র, পরস্পর-বিরোধী তথ্যের উপর ; যে-পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং যুদ্ধ করছি, তাঁর মিলনমন্ত্র একেবারে তার কেন্দ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে। এই উপাদানের আয়তন ও বৈচিত্র্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে ; রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা ব'লে তাঁর কবিতার রসবস্তুও স্বতন্ত্র ; তাঁর কাছে আমরা যা পাই, রবীন্দ্রনাথ তা দিতে পারেন না।

৩

ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতার দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত না-করলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। 'বিনিময়' কবিতার প্রথম স্তবক :

> তার বদলে পেলে—
> সমস্ত ঐ শুব্ধ পুকুর
> নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
> আলোয় ভরা জল—
> ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
> বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
> ভরল হৃদয়তল—
> একলা বুকে সবই মেলে।

তার বদলে—কার বদলে ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই এই কবিতার চাবি লুকোনো। য়োরোপীয় ভাষা হ'লে সর্বনামের লিঙ্গ দ্বারাই সেটা ধরা পড়তো, বাংলায় হয়তো বুঝতে একটু দেরি হয় যে 'সে' মানে কোনো অন্তর্হিতা প্রণয়িনী। তারপর, এটা বোঝামাত্র, সমগ্র কবিতাটির অভিঘাত প্রবল হ'য়ে ওঠে, 'একলা বুকে সবই মেলে'র মধ্যে হাহাকার শুনতে পাওয়া যায়। তেমনি, 'ওক্লাহোমা' কবিতায়—

> সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছ কি রুট ২৫-এ ?
> বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
> শব্দশেষ ছুঁয়ে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল ;
> মার্কিন ডাঙার বুকে কোড়ো অবসান গেল মিশে।
> অবসান গেল মিশে।

এখানে কোনো অস্পষ্ট 'সে'-র উল্লেখও নেই, কিন্তু এই তিন স্তবকের প্রতিধ্বনিত কবিতাটিতে চলন্তি ট্রেনের বিচ্ছেদের বাতাস এমন জোরে ব'য়ে চলেছে যে আমাদের মনে দুর্বারভাবে জেগে ওঠে কোনো বিদায়ের দৃশ্য—ট্রেন ছাড়বার আগে যা ঘটেছিলো তা অব্যক্ত থেকেও কবিতার পরতে-পরতে বিরাজ করছে। এই বিচ্ছেদের বেদনাই বার বার অনুভব করা যাচ্ছে অন্যান্য কবিতায়:

পৃথিবীতে লগ্ন ছিল এই মিলনের ঘর
এসেওছিলেম দুজনে—তারপর ? ('লিরিক'—পারাপার)

যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয় : দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥ ('অ্যান আর্বর'—পালা-বদল)

চলো, কার্মেলিতা, চলো আবার তোমার নিজ দেশে।
এখানে আসবে কাছে স্বপ্ন-চলনের বেশে
কান্না ঢেউ যোজন-যোজন পার হয়ে,...
এ আসা তো আসা নয়, হঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বুকের শহর চিরে
শোনো চেনা কণ্ঠ, দেখ চেনা চোখ তবে
মুহূর্তে মূর্ছায় সব শেষ হবে।...
দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার,
কার্মেলিতা, দেখ এক প্রেম পারাবার ॥ ('পরিচয়'—পারাপার)

আর তারপর 'পালা-বদলে'র 'রাত্রি' কবিতায় 'হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,/দেখি তুমি নেই'—আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লিপিকা'র 'পরির পরিচয়', এবং বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় মন আবহমানভাবে যে-বিরহের গান গেয়েছে, তার ধারা সমকালীন বাঙালি কাব্যে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। সুখের সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়, অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে যতই ভিন্নধর্মী হোক, 'অর্কেস্ট্রা'ও বিরহের কাব্য, 'বনলতা সেন'ও তা-ই। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণতা', সুধীন্দ্রনাথের 'নাম', জীবনানন্দর 'আকাশলীনা', অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়'—এই সব আপাত-বিসদৃশ কবিতার মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ দেখিয়ে কোনো মনোজ্ঞ আলোচনা কেউ একদিন লিখবেন আশা করি।

৪

আমার পরিসর বেশি নেই, এই আলোচনা কোনো অর্থেই সর্বাঙ্গীণ হবে না, তবু অন্য দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপরিহার্য। একটু পিছনে স'রে যাওয়া যাক, সেই যখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'মাটির দেয়াল'

বেরিয়েছিলো। সেই সময়ে ঐ পুস্তিকা যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁদের চমক লেগেছিলো অমিয় চক্রবর্তীর অন্য একটি গুণপনায়—যাকে, অন্য নামের অভাবে, অগত্যা হাস্যরস বলতে বাধ্য হচ্ছি। বেদনামিশ্রিত হাসি—ব্যঙ্গ নয়, অভিযোগবর্জিত—নিজের অবস্থাটাকে মেনে নেবার মতো সুস্মিত প্রসাদগুণ, অথচ নিজেকে অন্য কেউ ব'লে জানবার মতোও বুদ্ধি—এই রকম ভাবসন্নিপাতে তৈরি হয়েছিলো 'বিধুবাবুর মত', ('মতো' নয়) 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'মামুলি' ('মন রে আমার মন / কোন সাধনার ধন / হাড়ের বাক্সে'), 'লগ্ন' ('চমকিয়ে ওঠে কবিতায়/ডাঁটাসুদ্ধ রাঙা পালং শাক')—হালকা কবিতা, কিন্তু অর্থের দিক থেকে হালকা নয়। এর সবগুলো রচনা 'পারাপারে' দেখতে না-পেয়ে নিরাশ হয়েছি, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণও পেয়েছি সম্ভবত একই সময়ে লেখা 'সাবেকি' কবিতায়—

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

গৌড় বসাকের প'ড়ে রইল ভরন্ত খেত খামার।

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই কলম ঠেলি, যখন তখন শুনে ফেলি

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

শুনব না আর যখন কানে বাজবে তবু এই এখানে
রাম নাম সত্ হ্যায়॥

একটি চির-পুরোনো বিষয় লৌকিক ছন্দের দোলাতে নিটোলভাবে নতুন হ'য়ে উঠলো, আরম্ভে 'গেল' কথাটার রেশ-টেনে-চলা আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত মজায় ভরপুর—যদিও বিষয়টা একেবারেই 'মজার' নয়। এত বড়ো দুঃখের কথায় এতখানি কৌতুক যিনি আমদানি করতে পেরেছেন তাঁকে হাস্য-রসিকের চেয়ে বড়ো অর্থেই রসিক বলতে হয়। এই হাসিরই আভাস পাওয়া যায় 'পালা বদলে'র প্রথম কবিতায় 'হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়' সম্বোধনে।

যদিও 'পারাপার' ও 'পালা-বদল' একসঙ্গে পঠনীয়, এবং দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, তবু 'পালা-বদলে' কবি আরো অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমটিতে যে-নূতনত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে দ্বিতীয়টিতে তার সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এবং 'পালা-বদলে' কয়েকটি নূতনতর ধরনও স্থান পেয়েছে :

কলাকৌশলে চমকপ্রদ 'অপঘাত' (রবীন্দ্রনাথের 'ফিনল্যাণ্ড ধ্বংস হ'লো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে'র সঙ্গে যেন সচেতন প্রতিযোগিতা ক'রে লেখা), গভীর চিন্তায় ভরা 'সঙ্গ' নামক কবিতা—যাঁরা মনের সম্পদ সৃষ্টি ক'রে থাকেন তাঁরা নিজ-নিজ নির্জনতার মধ্যেও কেমন ক'রে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করেন তারই কাহিনী, এবং 'ইতিহাস' নামক উৎকৃষ্ট এবং একাধিক অর্থে আমেরিকান কবিতার বিস্ময়। আমেরিকার একটি গ্রাম কী ক'রে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু-পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো উৎকৃষ্ট মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও-কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে-ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই, লেখক একটিও মন্তব্য করেননি; শুধু একটি পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি; বাংলা ভাষায় আর-কেউ লিখেছেন ব'লেও আমার মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহ'লে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।

৫

তাঁর ভাষাব্যবহার প্রথম থেকেই অভিনব ও চিত্তহারী, কিন্তু সম্প্রতি তার কোনো কোনো অংশ বিষয়ে আমার মনে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন জাগছে। 'পারাপার' ও 'পালা-বদলে' দেখা যাচ্ছে তল্ প্রত্যয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রতি হয়তো বা একটু অহেতুক আকর্ষণ, এবং বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে বিশেষণ বচনা করবার প্রবণতা। 'উত্তমতা' 'সহসতা', 'সংসারতা', 'আসন্নতা', 'আপনতা'—এদের বিষয়ে প্রথম কথা এই যে বাংলায়, বিশেষত বাংলা কবিতায়, বিশেষণই বিশেষ্যরূপে এবং বিশেষ্য সমাসবদ্ধ হ'য়ে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হবার শক্তি রাখে, দ্বিতীয়ত, দেশজ শব্দে তল্ প্রত্যয় সুশ্রাব্য নয়, এবং তৃতীয়ত, 'সংসারতা' বলতে যা বোঝায় তা 'সংসার'-এর মধ্যেই নিহিত আছে, মূল শব্দটাকে যথাযোগ্যভাবে খাটিয়ে নিলেই 'তা' আগমের প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনো দিক থেকে এগুলোকে যদি বা সমর্থন করা যায়, 'পুণ্যতা', 'জীবনতা' বা 'সংসর্গতা'র সপক্ষে কী যুক্তি দাঁড়াতে পারে আমি তা ভেবে পাই না। যা ব্যাকরণদুষ্ট তাকে তখনই শুধু মেনে নেয়া যায় যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন তার ফলে সংবাদে

বিভ্রান্তি আসে (যেমন এসেছিলো বিষ্ণু দে-র 'আহা যদি আজ পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ'-এ) কিংবা তা কোনোভাবেই কাজে লাগে না, তখন বোঝা যায় এলিয়ট কেন বলেছিলেন কবিতারও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার। 'দূরের স্মরণী বয় **পণ্যতায়** আঁকাবাঁকা ব্যস্ত দ্বীপের মধ্যে'—এখানে 'পণ্যতা'কে সমগ্রভাবে 'merchandise' অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু 'তুমিহীন **জীবনতা** তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে', 'সব তার **সংসর্গতা** অনাদি আদিম নীলালোকে', 'বন্ধুর আঙুল নৃত্যে চোখের তন্ময় **ধ্যানতায়**' কিংবা 'বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে দিলেন **পুণ্যতা** তীর্থ' —এই পংক্তিগুলির মধ্যে এমন কোনো দাবি নেই যা 'জীবন', 'সংসর্গ', 'ধ্যান' আর 'পুণ্য' দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। 'যৌবনী জনতা', 'চন্দনী ধূপ', 'শিল্পের তন্ময়ী গুরু'; যথাক্রমে 'যৌবন', 'চন্দন' এবং 'তন্ময়' পড়লে অর্থ একই থাকে এবং প্রসাদগুণ বর্তায়। 'স্মরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক', 'নরন্নী'—তরুণ লেখকদের উপর এ-সব ব্যবহারের প্রভাব ভালো হবে কিনা সে-বিষয়েও আমার সন্দেহ থাকলো।

'কবিতা'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ নিয়ে আলোচনা চলছে। বাংলা ফ্রী ভর্সের নমুনাস্বরূপ তাঁর কোনো-কোনো কবিতা দেখানো যেতে পারে, আমি কোনো সময়ে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলাম। আজ সেই কথাটি নতুন ক'রে উঠেছে, কেননা তাঁর সাম্প্রতিক ছন্দোবদ্ধ লেখাতেও সর্বত্র নিয়মিত পর্ববিভাগ পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ছন্দ-ব্যবহারে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন—এখানে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর আবার একটি সাদৃশ্য ধরা পড়ে—তার ফল মোটের উপর যা দাঁড়ায় তাকে অনেক ক্ষেত্রে ফ্রী ভর্স বলাই যুক্তিসংগত।

> ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
> থাকবে বহু লোক। এই গ্রাম
> তাহ'লে
> উঠে যাবে। ('ইতিহাস'—পালা-বদল)
>
> অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায় ('ওক্লাহোমা'—'পারাপার')
>
> শুতে যাই বুকে ভ'রে শ্রীরাগ ধ্রুপদে গম্ভীর—
> ('য়ুরোপা জাহাজে'—পারাপার)

এই পংক্তিগুলিতে ছন্দকে যেটুকু বেঁকিয়ে দেখা হয়েছে তাতে ছন্দের সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি: 'তাহ'লে'-কে চারমাত্রা 'অন্যমনস্ক' ছয়, এবং 'গম্ভীর'কে বিশ্লিষ্ট ক'রে প্রয়োজনীয় মাত্রা পুরিয়ে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে 'তাহ'লে'-তে একমাত্রা কম থাকার জন্যই ওর ব্যঞ্জনা আরো দীপ্তি পেয়েছে। এ-ধরনের উদাহরণ এখানে আমার আলোচ্য নয়। 'থাকবে',

'চলতে', 'বলতে', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ পয়ার ছন্দে দু-মাত্রায় আজকাল অনেকেই বিন্যস্ত ক'রে থাকেন, আমার মনে হয় এর ব্যবহার স্বল্প ও সুমিত হওয়া প্রয়োজন, এবং তার উপযোগিতা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনবর্ণের উপরেও নির্ভর করে। উদাহরণত, 'পালা-বদলে'র 'এই বৃষ্টি' কবিতায়—

> মনের প্রহরী **ভিজছে** ছাতি হাতে নিঃঝুম প্রহরে
> শুধু **ভিজতে** খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন আকাশে—

চিহ্নিত ক্রিয়াপদ দুটিকে প্রসন্নভাবে উচ্চারণ করা যায় না, 'ভিজছে'-র পরেই 'ছাতি' কথাটায় আরো বেশি হ'চট খেতে হয়। এ-রকম ক্ষেত্রে, মনে হয়, পদ্যের তুলনায় গদ্যকবিতার পথই প্রশস্ত ছিলো, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর মতো গদ্যকবিতায় নিপুণ শিল্পীর পক্ষে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে পদ্যের সংখ্যাই বেশি, কোথাও কোথাও তাঁর ছন্দ কারুশিল্পে উজ্জ্বল, এবং অন্য কোথাও একই রচনায় একাধিক প্রকার ছন্দ, অথবা পদ্যের সঙ্গে গদ্য মিশিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ নামই হ'লো ফ্রী ভর্স। 'পারাপার'-এর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার ছন্দের মধ্যে 'ভারতবর্ষের আকাশে' পংক্তিটা স্পষ্টত গদ্য (যদি না ওটা মুদ্রাকর বা লেখকের অনবধানতাবশত ঘ'টে থাকে), 'ফ্রাইবুর্গের পথে'র কোনো-কোনো পংক্তি যেন পয়ারের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের আমেজ এনেছে, 'একটি গান শোনা' কবিতায় 'ত্রিশূল স্থির / সুরের শাদা চূড়ো', এ-দুটি পংক্তি পঞ্চমাত্রিক ব'লে মনে হয়, কিন্তু তারপরেই কয়েকটি পংক্তি গদ্যে লেখা, আবার দ্বিতীয় স্তবকে 'কোলাহল মিলে মিলে যায় ধ্বনির পাপড়ি ঝরে ধ্যানে/এলো হাওয়া মরুতাপসিক' এ-সব পংক্তি পয়ারের সুরে পড়তে প্রলুব্ধ হই আমরা। এমনও হ'তে পারে যে লেখক সমস্তটাকেই গদ্যকবিতা ব'লে উপস্থিত করতে চেয়েছেন—সেটা খুবই সম্ভব—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় যেমন প্রত্যেকটি পংক্তিকে পরিষ্কার গদ্য ব'লে চেনা যায়, ভুলেও কখনো ছন্দের সুর লাগে না, অমিয় চক্রবর্তীর রচনা প্রথম থেকেই তার উল্টো পথে চলেছে : অর্থাৎ তিনি সচেতন বা অচেতনভাবে (সম্ভবত সচেতনভাবেই) গদ্যের ফাঁকে-ফাঁকে পদ্যের বিনুনি গেঁথে দেন। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া নিয়মিত ছন্দে তিনি অনেক লিখেছেন, স্মরণীয়ভাবেও লিখেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে, যেন ইচ্ছে ক'রেই কী-রকম অসম বা বি-ষম পংক্তি ব্যবহার করেন, 'পালা-বদল' থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি

> আয়ুঃক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে ('এরোপ্লেনে')
> কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা ('দিন')
>
> বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে······('ইতিহাস')
>
> দ্রুত হয় ঝংকারে ঝংকারে গীতাঙ্গনে
> তোমার তন্ময় আঙুল ('রাগিণী')

স্বরবৃত্তেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়

> **সারা বসন্ত** কাশ্মীরি বন জাফ্রানি বাস···
> তবুও দেখ **সাহারার জিভ বালির প্রখর** ('বিসংগতি')

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলিকে মাত্রাবৃত্তে না-প'ড়ে উপায় নেই, যদিও অন্য পর্বগুলি স্বরবৃত্তের। ৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দিঘি' নামক ছোটো ও সুন্দর কবিতাটিতে, আমার বিবেচনায়, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও পঞ্চমাত্রিক, এই তিন রকম ছন্দ স্থান পেয়েছে ; প্রথম পংক্তি—'যেখানে সে ডুবে আছে' পয়ার ও স্বর-বৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান। পয়ারের মধ্যে বি-ষম পর্বাক্তর সুষ্ঠুতা বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছি না, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন 'পারাপারে'র 'বৈদান্তিক' কবিতায়) এই মিশ্রণের ফল উপাদেয় হয়েছে, সতর্কভাবে এ-পথে পরীক্ষা করতে থাকলে বাংলায় মুক্ত ছন্দ বা মিশ্র ছন্দের একটি প্রকরণ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। এই সম্ভাবনাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, যাঁরা বলতে চান এগুলো নিয়মিত ছন্দেরই অন্তর্ভূত, তাঁদের কথা আমি বুঝতে পারি না।

১৯৫৫

নিশিকান্ত : অলকানন্দা

প্রথমেই ব'লে রাখি যে নিশিকান্তর কবিতার আমি অনুরক্ত। তাঁর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' ('কবিতা'য় প্রকাশিত) বাংলা গদ্যকবিতার মধ্যে একটি প্রধান রচনা ব'লে আমি মনে করি। কিন্তু এ-কবিতাটি 'অলকানন্দা'য় নেই; এ-গ্রন্থে লেখকের ছন্দের কবিতাই শুধু সংগৃহীত, তাও সব কবিতা নয়; তাঁর প্রাক্-পণ্ডিচেরি জীবনের কোনো রচনাই স্থান পায়নি, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'টুকরি'ও না। বস্তুত, নাম-পত্র ও উৎসর্গ-পত্র থেকে শুরু ক'রে বইটির সর্বত্র একটি নিবিড় পণ্ডিচেরি-আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত, এমনকি লেখকের নামের নিচে ব্র্যাকেটে 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম' কথাটি বসানো আছে, যাতে পাঠকের তাঁর গোষ্ঠী সম্বন্ধে ভুল না হয়। তাছাড়া, অনেকগুলি, এমনকি এক হিশেবে সবগুলি, কবিতার বিষয়ও এক, যোগসাধনার ফলে লেখকের জন্মান্তর, শ্রীঅরবিন্দ ও 'শ্রীমা'র প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি—বিভিন্ন ছন্দে ও বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে এই একই কথা তিনি বলেছেন। বইয়ের মলাটে প্রকাশকও জানিয়েছেন যে 'শ্রীঅরবিন্দের দিব্যস্পর্শে তাঁর কাব্য অপরূপ রূপ নিয়েছে।'

এ-অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ, যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে নিশিকান্তর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া অশোভন ঠেকতে পারে; কিন্তু আমি, সত্যি বলতে, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ; তাছাড়া কবিতাকে ধর্মসাধনার একাধারে ফল ও উপায়হিশেবে না-দেখে কবিতা হিশেবে দেখাই আমার মতে যুক্তিসংগত। আর কবিতা হিশেবে 'অলকানন্দা'র বেশির ভাগ রচনাই নিতান্ত অধার্মিক পাঠকেরও ভালো লাগবে, সে-কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। ছন্দে, বিশেষ ক'রে তিন মাত্রার ছন্দে, নিশিকান্তর নিশ্চিত ও লঘু আধিপত্য পদে-পদে আমাদের প্রশংসা কেড়ে নেয়; কথা দিয়ে ছবি আঁকতে তিনি ওস্তাদ। কান ও চোখ এ দুটি ইন্দ্রিয়ই তাঁর রচনা থেকে তৃপ্তি পায় প্রচুর। বইটি খুলেই যখন পড়ি—

> অচিন্ত্যমুখ-উৎপল, ওগো যুগলভ্রমর আঁখি দুটি!
> ফুটি' তব সাথে তোমারি কুহুমে তোমার অমিয় লব লুটি;

তখনই মন বিচিত্র ও নিবিড় উপভোগের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ওঠে। আর যদিও 'নিগুঢ় বয়ান' কি 'জন্মদিন' কি 'পথিক' ছন্দের নৈপুণ্য ও একাধিক আকস্মিক ভালো পংক্তি সত্ত্বেও অতিভাষণে শিথিল, এবং শেষের দিককার 'ত্রিজন্ম', 'সন্তান', 'ভাস্কর' প্রভৃতি পয়ারে লেখা কবিতা ছন্দে গাঁথা ধর্মতত্ত্ব

মাত্র, তবু মোটের উপর আমাদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় না। 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তরে' যে-গুণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এবং যা আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে নিশিকান্তর বৈশিষ্ট্য, তা এই বইয়ের অনেক কবিতাতেই বর্তমান। সে-গুণ আর-কিছুই নয়—অদ্ভুত, সুদূর, অতিপ্রাকৃত ছবি আঁকবার ক্ষমতা, এমন ছবি, যা আমাদের নিত্যপরিচিত জগতের নয় তবু যাদের সত্য ব'লে না-মেনে উপায় নেই। কবিতার কলাকৌশলে নিশিকান্ত বরাবর ঐতিহ্যকে মেনে চলেছেন কিন্তু তাঁর কল্পনা খাপছাড়া, রাজপথ ছেড়ে বাঁকাচোরা অলিগলিতে ভ্রাম্যমাণ। 'গোরুর গাড়ি' ও 'মহামায়া' এ দুটি কবিতাতেই তাঁর এই স্বকীয়তা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট।

চলে জীবনের দুর্গম কান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থ বৃষভযান,
প্রতি আবর্তে মুখরায় দুই ধারে
যুগল চাকায় ভারাক্রান্ত প্রাণ।
* * *
ওরি সাথে যেন অনন্তকাল চলে
ধরি' সত্যের সুবর্ণ সম্ভার,
দিবস নিশার যুগল চাকার বলে
কোন সে উষার পানে বহে অভিসার।

শত শতাব্দী আবর্তসংঘাতে
ভরে দিগন্ত আকুল আর্তনাদে,
তবু আনন্দস্বপনের শিখা জ্বলে
উদয় সূর্য শশাঙ্ক তারকার। ('গোরুর গাড়ি')

এই স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ছবিটি স্বতই আমাদের কল্পনাকে মুগ্ধ করে; আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে যাই, নিঃশব্দে মেনে নিই। কিন্তু আরো বেশি বলশালী, চিত্ররূপে আরো বেশি সমৃদ্ধ 'মহামায়া' কবিতাটি—যেখানে প্রায় কয়েক পংক্তি পর-পরই এক-একটি নতুন ছবি আমাদের মানসদৃষ্টিকে বিস্মিত করে—কারণ প্রতিটি ছবিই উজ্জ্বল ও নতুন। পুরো কবিতাটিই উদ্ধৃতির যোগ্য ('কবিতা'র পাঠকেরা পুরোনো সংখ্যায় এটি খুঁজে পাবেন), কিন্তু কয়েকটি পংক্তি আছে যা উদ্ধৃত না-করলেই নয়। যেমন:

দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি' দাঁড়ায়েছে তালতরু

সরলতা, ধ্বনিগৌরব ও চিত্ররূপের সমন্বয়ে এ-পংক্তি এতই সুন্দর যে প্রকাশক-ব্যবহৃত 'অপরূপ' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে পর্যন্ত লোভ হয়; আর তার পরেই যখন পড়ি—

নেভে আর জ্বলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্বুদ।
অট্টহাসিছে রাতের অট্টালিকা
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকা-বিদ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালি তীরের ফলক জ্বলে,
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির-দীর্ণ
স্বর্ণহীরক হাসে।

তখন সন্দেহ থাকে না যে নিশিকান্তর মধ্যে এমন উপকরণ আছে যা দিয়ে বড়ো কবি তৈরি হয়। বিড়ালের চোখকে এমন একটি অর্থময় উপমা দিয়ে যিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনি দেখতে জানেন—এবং দেখাতেও জানেন। নিশিকান্তর কবিতা যখন সবচেয়ে ভালো, তখন তা ভালো অর্থে জমকালো, কারণ অলংকরণে তিনি অকৃপণ ও পারদর্শী। যে-সব কবিতায় ভক্তের অতল প্রশান্তি প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, সেখানেও 'গীতাঞ্জলি'র সরল স্বল্পভাষিতা নেই, তাঁর কবি-প্রকৃতি সন্ন্যাসীর নয়, বিলাসীর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পে ও ঝংকৃত বাক্যচ্ছটায় তাঁর আনন্দ। 'স্ফটিকপাত্র', 'অগ্নিবাণ' 'অশ্রান্ত', ও এই তিনটি কবিতারও ধ্বনিকল্লোল আমার ভালো লাগলো।

স্ফটিকপাত্রের মত এ-সম্বিৎ রেখেছি ধরিয়া···
যায় দিন, যায় সন্ধ্যাবেলা,
রাত্রির আঁধার যায়, প্রভাতের স্বর্ণময় খেলা
আসে যায়, একে একে আসে যায় সুখের দুখের
ক্ষণগুলি, তারা যে মিলায়ে যায় মোর আনন্দের
সর্বভুক স্বচ্ছতায়। ('স্ফটিকপাত্র')

অব্যর্থ শরের মত চলিয়াছি আমি অনুক্ষণ
আমার লক্ষ্যের পানে।
হে ধানুকী! আমি তব তীর,··
প্রিয়তম!

আমি তব প্রেম দিয়ে প্রজ্বলিত শিখার শায়ক,
চুম্বনবহ্নিতে মোর প্রতি বস্তু, প্রত্যেক পলক
জ্ব'লে ওঠে। ('অগ্নিবাণ')

আরো একটু সংহত, শব্দের ব্যবহার আরো গাঢ় ও ইঙ্গিতময় হ'লে এ-সব কবিতা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারতো।

এ-কথা যদি ঠিক হয় যে ভালো কবি হবার উপকরণ নিশিকান্তর মধ্যে আছে, তাহ'লে সে-উপকরণের তিনি কী-রকম ব্যবহার করেন তার উপরেই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পণ্ডিচেরির আশ্রমের প্রভাব তাঁর কবিপ্রকৃতির উপর শেষ পর্যন্ত কতখানি শুভ হবে তা বলা শক্ত; ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ফলে তাঁর পরিপ্রেক্ষিত বিকৃত হওয়া অসম্ভব নয়, অর্থাৎ তাঁর রচনা সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগত, অদীক্ষিতের-জন্য-নয় গোছের হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। এ-কথা আমি অনুমানে মাত্র বলছি না, এর লক্ষণ 'অলকানন্দা'তেই বর্তমান।

১৯৪০

অন্নদাশঙ্কর রায় : 'নূতনা রাধা'

কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করবার সৌভাগ্য বাঙালি কবিদের প্রায়ই হয় না; প্রৌঢত্বে কিংবা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি কাব্যসঞ্চয়নই তাঁদের জীবনব্যাপী কবিকর্মের নিদর্শন হ'য়ে থাকে। কাব্যসঞ্চয়ন-প্রকাশের প্রথাও আমাদের দেশে অল্পদিনের; দেবেন্দ্রনাথ সেন বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের ও-রকম কোনো সঞ্চয়নগ্রন্থ নেই, তাঁদের বইগুলিও লুপ্তপ্রায়, ফলে আধুনিক পাঠকের তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের রাস্তা বন্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ অনেকদিন হ'লো ছাপা নেই, কেন তাদের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না জানি না। দোকানের শেলফ থেকে বসুমতী, বসুমতী থেকে ফুটপাত, এবং ফুটপাত থেকে অবলুপ্তি—এই তো বাঙালি লেখকের সাধারণ ভাগ্য, তার উপর কবিভাগ্য বিশেষরূপে শোচনীয়, কেননা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ব্যবসার দিক থেকে লোভনীয় নয়। আমাদের বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় কবিদেব সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করবার সংবুদ্ধি কি কোনোদিন কোনো প্রকাশকের হবে না?

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ভবিষ্যতের কিংবা অদৃষ্টের উপর ভরসা রাখেননি, তিনি প্রাক্-চল্লিশেই নিজের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এ-ধরনের উদ্যম তাঁরই প্রথম। অবশ্য সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ হ'লেও বইটির আকার বেশি বড়ো নয়, মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠা। 'কাগজের দাম বুঝে অনেক কবিতা' তিনি গ্রহণ করেননি, সম্প্রতি প্রকাশিত 'উড়কি ধানের মুড়কি' ও 'পরবর্তী কালের' ব'লে এ-বই থেকে বাদ গেছে। তাহ'লেও এটা বোঝা যায় যে তাঁর কবিতার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কবিতাগুলি বারো বছর ভ'রে লেখা, এবং 'নূতনা রাধা' তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যলেখক হিশেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। একটি স্বচ্ছ উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী। তাঁর গদ্যরচনায় সেই জাদু আছে যার প্রভাবে বক্তব্য বিষয়ে মৌলিক মতবিরোধ থাকলেও শিল্পকর্ম হিশেবে সেটি উপভোগ করতে বাধে না। এমন গদ্যরচনা তাঁর কলম দিয়ে কমই বেরিয়েছে যা উপভোগ্য নয়। প্রথম জীবনে তিনি গদ্য-পদ্য সমানে লিখছিলেন, পরে গদ্যের দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকেছেন। 'নূতনা রাধা' প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে তাঁর কবিত্বশক্তি, গদ্য-সতিনের প্রসারের চাপে, তাঁর জীবনগৃহের একটুখানি জায়গা মাত্র মাত্র জুড়ে আছে, তার মূর্তিটি কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতার, ঐশ্বর্যশালিনী জীবনসঙ্গিনীর নয়।

'প্রথম স্বাক্ষর' ও 'রাখী' 'নূতনা রাধা'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ। এই কবিতাগুলি ভাববিলাসী নবযৌবনের সহজ আবেগ থেকে উৎসারিত, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতার আনন্দে কবি এ-জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে উপভোগ করবেন, এই কথাটি নানা ছন্দে, নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথাটি নতুন নয়, প্রায় সকল তরুণ কবিরই এই কথা, কিন্তু এই ভাবটি প্রায় একই সময়ে লেখা 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর যেমন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছিলেন, কবিতায় ঠিক সে-রকমটি হয়নি। রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট। এরই মধ্যে 'রাখী'র উৎসর্গের চারটি পংক্তিতে কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে :

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমায় আমায় মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

তৃতীয় গ্রন্থ 'একটি বসন্ত' থেকে পরিণতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট আবেগ-নীহারিকার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দিয়েছে সংহতির আভাস। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 'নূতনা রাধা'য় প্রেমের ও প্রকৃতির অনুভূতি বিচিত্র ভঙ্গিতে লীলায়িত। এই পাতাগুলির মধ্যে কয়েকটি আশাপ্রদ প্রেমের কবিতা পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি— 'পূর্ণিমা' :

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে ভালো।
আকাশ হ'তে খালি কুসুম ঝরে
মাটির ফুলদানি কাটিয়া পড়ে
ধরায় ধরে না যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো খেদ নাই।
আমার জামাখানি বুনিছে তা সে
কদাচ মুখ তুলে মুচুকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

'জামাখানি' ও 'তা সে' এ-দুটি কথা দাঁতে কাঁকরের মতো হ'লেও কবিতাটি ভালো।

আমার নিজের সবচেয়ে ভালো লাগলো 'জার্নাল' অংশ। এই ছোটো-ছোটো টুকরো কবিতাগুলিতে কবির প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ যেন উপচে পড়ছে—অথচ আতিশয্য কোথাও নেই, সবটুকুই স্নিগ্ধ ও কমনীয়।

জীবন কী বিমোহন রে জ্যোৎস্নাবিকিরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি' তরণী দুলিছে জলগাত্রে।
ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে!

মনের এই কথাটুকু—শুধু নিজের নয়, পাঁচজনের মনের মতো ক'রে বলতে পারা যে শক্তিসাপেক্ষ, শুধু তা-ই নয়, ভাগ্যের অনুকম্পা হ'লে তবেই যে তা বলা যায়, এ-কথা আর কেউ না জানুক, অন্য কবিরা জানেন। এ-সব জিনিশ ভারি ওজনের নয় ব'লে সাধারণ পাঠক অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু কবিদের কাছে এরা উপেক্ষণীয় নয়।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এটি প্রকৃতিবর্ণনার :

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভপ্রাঙ্গণে বায়ুরণে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথতুরঙ্গ ধাবনরভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোমমার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক্ বলে দেয় ধরায়।

এ-রকম সংকলনযোগ্য 'জার্নালে' আরো আছে।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'ক্রীডো' কবিতায় বলেছেন—'মনের কথা মনের মতো ক'বে/কইবো আমার মনের মতনকে, / কবি হবার নেই দুরাশা ওবে / সার মেনেছি সত্যকথনকে।' 'নূতনা রাধা' তাঁর এই ক্রীডকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। উচ্চাভিলাষী বলা যেতে পারে এমন একটি কবিতাও এতে পাওয়া যাবে না, তাঁর সাহিত্যিক উচ্চাশার ক্ষেত্র গদ্য, পদ্য তাঁর শখ। কবিত্ব নামক বস্তুটির যে তিনি অধিকারী, তাঁর গদ্যই তার সাক্ষী দেবে—কিন্তু কবিত্বময় গদ্য-লেখককে কবি ব'লে মানতে আধুনিক পাঠক অনিচ্ছুক, অন্নদাশঙ্কর নিজে তো কিছুতেই রাজি নন—'নূতনা রাধা' প্রকাশ ক'রে কবি-নামের উপর দাবি জানালেন তিনি। বইখানা আগাগোড়া প'ড়ে মনে হয় যে উইলিয়ম মরিসের মতো ইনি একজন সুখী কবি, এবং সকলেই জানেন যে সুখী কবি বিরল। কবি হ'য়েও ইনি কোনো দুঃখের গান করেননি, না ব্যক্তিগত, না বিশ্বমানবিক দুঃখের। দুঃখের গানই হয়তো আমাদের মধুরতম গান, কিন্তু এই কবিতাগুলিও যে মধুর তা মানতেই হবে। অন্নদাশঙ্করের বিশেষত্ব তাঁর ভাষার লাবণ্য, তাঁর ভঙ্গির কমনীয়তা, তাঁর আনন্দিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। শুধু প্রিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রেমেই তিনি পাগল, আপন সুখ-নীড় ও বিশ্বপ্রকৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি এত সুখী যে সেই সুখ কবিতায় প্রকাশ না-ক'রে তাঁর মন শান্ত হ'তে চায় না। তাঁর রচনায় wit-এর দ্যুতি থেকে-থেকে ঝলক

তুলছে, আর প্রায়ই তিনি সতেরো শতকের রাজভক্ত ইংরেজ কবিদের কথা মনে করিয়ে দেন ; এ-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের পরে যথার্থ হালকা কবিতা আধুনিক বাংলায় যাঁরা লিখতে পেরেছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে ও অজিত দত্ত—কেউ-কেউ হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর কোনো-কোনো রচনাকেও এই শ্রেণীতে ফেলতে চাইবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে হালকা কবিতা গুণে লঘু নয়, এবং কবিত্বের সঙ্গে হাসিঠাট্টার বিবাহ ঘটাতে হ'লে পাকা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। এই পৌরোহিত্যের সব গুণই অন্নদাশঙ্করের আছে, এই কারণে বাংলা কাব্যে তাঁর স্থান স্বীকার্য। আমাদের আক্ষেপ শুধু এই যে তিনি আরো বেশি লেখেন না। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠককেই আনন্দ দিয়েছে, হালকা কবিতার ক্ষেত্র তিনি যেন আরো নিবিড়ভাবে কর্ষণ করেন এই আমাদের অনুরোধ। তাঁর কবিত্ব-বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক্ষা আমরা সাগ্রহে করবো।

১৯৪২

পুনশ্চ

অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি, প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। কিছুদিন ধ'রে দেখছি, হালকা কবিতার ক্ষেত্রে পূর্ণোদ্যমে নেমেছেন অন্নদাশঙ্কর। 'উড়কি ধানের মুড়কি' লেখবার সময় তিনি ছড়াকে আবিষ্কার করেছিলেন, তারপর থেকে ছড়ার মধ্যে আবিষ্কার করছেন নিজেকে। আবিষ্কার করেছেন, বলা উচিত, কারণ তাঁর ছড়াগুলি যদিও অধিকাংশ ছোটোদের পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তবু আসলে সেগুলি বয়স্কপাঠ্য ; আমি বাজি রেখে বলতে পারি কোনো সাধারণ শিশু তার পূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারবে না—তবে এই শেষের কথাটি হয়তো সাহিত্য নামের যোগ্য যে-কোনো শিশুপাঠ্য রচনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' সুদ্ধু। শিশুদের জন্য পৃথিবীতে যা-কিছু লেখা হয়, হয় তার উদ্দেশ্য শিক্ষা, নয়তো বিবিধ লোভনীয় সামগ্রী সাজিয়ে খেলনার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া তার চেষ্টা। কিন্তু কখনো-কখনো এমন হয় যে লেখা, শিক্ষার কি আমোদের পথে যাত্রা ক'রেই, পৌঁছয় তার পরপারে, উত্তীর্ণ হয় রসলোকে, আর তা যখন হয়, তখনই সে-লেখা বয়স্কভোগ্য হ'য়ে ওঠে ; তার মধ্যে ধরা পড়ে দুটো স্তর, একটা তৃপ্ত করে বালকবালিকার

চোখ, কান, কৌতূহল, ও কল্পনার উৎসুকতাকে, আর-একটাতে পূর্ণবিকশিত বুদ্ধির আনন্দ। অন্নদাশঙ্কর যে-সব ছড়া আজকাল লিখছেন, সেগুলি ছোটো এবং আঁটোসাঁটো; লঘু অথচ অত্যন্ত তরল নয়; উজ্জ্বল, কিন্তু উগ্র নয় কখনো; চটুল, যদিও সর্বদা সৌজন্যসম্মত—ছন্দে মিলে বাক্‌চাতুর্যে, কৌতুকের বক্রতায়, ইঙ্গিতের বিকিরণে প্রায় প্রতিটি পদ্যই যথোচিত, অনধিক ও সুসম্পূর্ণ, এক-একটি তো (যেমন, 'কেশনগরের মশা') ও-ধরনের রচনার উৎকর্ষের উদাহরণস্থল। এখন মনে হচ্ছে যে পদ্যের ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্করের মনের স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল আবেগ নয়, কৌতুক; কৌতুকের ক্ষেত্রে তাঁর মন স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে, যা বিষ্ণু দে-র মন পারে না। বিষ্ণু দে-র কথা এ-প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই মনে এলো, কারণ হালকা পদ্যের পথে তিনি যাত্রা করেছিলেন প্রথম পর্যায়ে, আবার সাম্যবাদের প্রেরণা তাঁকে সে-পথে এনেছে: কিন্তু কী তাঁর ১৯২৮-এর ট্রিওলেটে, কী তাঁর ১৯৪১-এর বুড়ো-ভোলানো ছড়ায় এমন একটি আত্মসচেতন ভঙ্গি আছে যাতে মনে হয় যে এ-পথ তাঁর সত্যিকার পথ নয়। যে-উন্নাসিক উপত্যকা তিনি ঘোষণা ক'রে ত্যাগ ক'রে এসেছেন, সেটাই তাঁর স্বদেশ, দুরূহতাই তাঁর ধর্ম, সাধারণ পাঠকের প্রতি অবজ্ঞাতেই তাঁর শক্তি। তাঁর দুরুহ কবিতা কষ্ট দিয়েছে পাঠককে, কিন্তু সুবোধ্য হ'তে গিয়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন নিজে, অথচ সুবোধ্য হ'তে কি পারছেন? পক্ষান্তরে, অন্নদাশঙ্করের পক্ষে সহজ হওয়াটাই সহজ, তাই হালকা কবিতার মর্মস্থলে পৌঁছতে তাঁকে যে কিছুমাত্র চেষ্টা করতে হয়েছে এমন কোনো চিহ্ন তাঁর রচনায় নেই। পদ্যগুলি বেশির ভাগ সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বন করেছে ব'লে তাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে—কিন্তু তা-ই বা বলি কেমন ক'রে, সাময়িকতার আমেজ কেটে গেলেও এদের আন্তরিক স্বাদুতা, এদের বিন্যাসের নৈপুণ্য নষ্ট হবার তো কারণ নেই—তাছাড়া সাময়িকতার দিকে ছড়ার স্বাভাবিক উন্মুখতা দুর্নিবার। কেউ যদি একে কবিতা বলতে না চান না-ই বললেন, না-হয় এ পদ্য সাংবাদিকতাই হ'লো, কিন্তু সাংবাদিকতা—শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও—কখনো-কখনো সাহিত্যের, এবং স্থায়ী সাহিত্যের, আসন পেয়েছে, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল নয়। মূল্যটা যেখানে মতের সেখানেই অচিরতার আশঙ্কা, কিন্তু মূল্যটা যেখানে রূপের সেখানে অনেকটা নির্ভয় হওয়া যায়।

কোনো সাংবাদিক রচনা সাহিত্যের স্তরে পৌঁছলো কিনা, সেটা যাচাই করার একটা উপায় হ'লো নিজেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যে লেখাটা আমার যে ভালো লাগলো তা তথ্যের জন্য, না মতের জন্য, না রূপের জন্য। মনে-মনে যদি এ-কথা বলি যে লেখাটা যেমনই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা খুব ভালো কথা, তাহ'লে তাকে আর যা-ই বলি সাহিত্য বলা চলবে না। আর যদি মনে হয় যে লেখক ভুল বলছেন, তাঁর কথা মানি না, কিন্তু লেখাটা ভালো লাগলো,

তাহ'লেই বুঝতে হবে যে সাহিত্যের শক্তি তার মধ্যে কাজ করেছে। আর যদি উভয়কে পাওয়া যায় একই সঙ্গে, তাহ'লে তো কথাই নেই। কিন্তু সেখানেও আমরা এ-বিষয়ে অবহিত হবো যে যেটা ভালো লাগছে, এবং যার জন্য ভালো লাগছে সেটা মত নয়, তথ্য নয়, সেটা রূপ। অন্নদাশঙ্করের পদ্য আমার পছন্দ, মতামতও পছন্দ; মতামত যদি ভালো না লাগতো তাহ'লেও পদ্য ভালো লাগবার বাধা হ'তো না, কিন্তু পদ্য ভালো না-লাগলে অত্যন্ত মনের মতো মতও মনোনীত হ'তো না কিছুতেই। ছড়া লিখতে ব'সেও বিষয়টা অন্নদাশঙ্করের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য, সাম্প্রতিক ঘটনার উপর মন্তব্য করতে গিয়েও তাঁর শিল্পী-মনই প্রকাশ পেয়েছে, রচনার রূপ বিষয়কে অতিক্রম করেছে, তার আনন্দ পার হয়েছে সাময়িকতার সংকীর্ণতা।

১৯৪৫

দু-জন তরুণ মৃত কবি : ফাল্গুনী রায়

ফাল্গুনী রায়ের কবিতায় তারুণ্যের সবগুলি লক্ষণ সুস্পষ্ট। যে-বয়সে মানুষ স্বপ্নচালিতের মতো কবিতা লেখে, কথাগুলি একটার পিঠে আর-একটা অপ্রতিরোধ্য বেগে এসে পড়ে, কলম একবার চলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না, এই কবি সে-বয়স কখনো পার হননি। যদি তিনি তিরিশ বছর পর্যন্তও বাঁচতেন, তাহ'লে হয়তো এ-সব কবিতার অধিকাংশ তাঁর নিজেরই বর্জনীয় ব'লে মনে হ'তো; কিন্তু অকালমৃত্যুর শোচনীয় যতিপাতের ফলে শুধু কয়েকটি বাল্যরচনাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয়ের চিহ্ন হ'য়ে রইলো। মৃত্যুর পরে তাঁর যে-সব কবিতা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বারোটি এই বইয়ের জন্য আমি নির্বাচন করেছি। এই বারোটি কবিতায় ফাল্গুনীর যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা উপেক্ষণীয় নয়।

এই কবিতাগুলিতে একটা আনকোরা উদ্যম ছন্দের ঝংকারে, অলংকারে ও অনুপ্রাসে আপনাকে প্রকাশ করেছে। প্রকাশের ভঙ্গিতে উগ্রতা কিছু বেশি। সম্পদ আছে, পরিচ্ছন্নতা নেই; শক্তি আছে, সংযম নেই। রচনাগুলি উচ্ছৃঙ্খল, প্রগল্‌ভ, অনর্থক অনুপ্রাসে আবিল, অত্যধিক পুনরুক্তিতে ক্লান্তিকর। এগুলি দোষের কথা, কিন্তু ফাল্গুনীর পক্ষে দোষের কথা নয়, কেননা এগুলি সবই তারুণ্যের ধর্ম। পৃথিবীর কোনো কবিরই বাল্যরচনা এ-সব দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কলমের মুখের রাশ ধরতে জানা সাধনাসাপেক্ষ, সে-সময় এ-কবি তাঁর জীবনে পাননি। শিল্পসৃষ্টিতে শুধু শক্তিই যথেষ্ট নয়, শক্তিকে সৌন্দর্যে পরিণত করা চাই। যাকে সুষমা বলি, শ্রী বলি, সেইটেই শিল্পকলার চরম লক্ষ্য। সেটা সহজে হয় না। ফাল্গুনীর কাছে সেটা আশা করাই অন্যায়; তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ই তাঁর শেষ পর্যায়।

তা-ই যদি হয়, এ-সব কবিতা যদি ছেলেবয়সের অনুশীলন মাত্র, তাহ'লে তাদের সকলের সামনে টেনে বের করা কেন? শুধু কি মৃত ব্যক্তির স্মৃতি-রক্ষার গরজে? তা নয়। ফাল্গুনীর কবিতাগুলির নিজস্ব মূল্য কিছুই যদি না থাকতো তাহ'লে এ-বই প্রকাশ করতে তাঁর বন্ধুদের আমি উৎসাহিত করতুম না। 'বারোটি কবিতা' পড়ে বোঝা যাবে যে এগুলি মাথা ঘামিয়ে খেটে-খুটে লেখা নয়, অসংবরণীয় আবেগের ধাক্কায় ছিটকে-পড়া। জাত-কবির লক্ষণই এই যে তিনি কথার প্রেমে গভীরভাবে মগ্ন, কথাগুলি তাঁর কাছে

ভাবপ্রকাশের উপায়মাত্র নয়, তাদের নিজস্ব রূপবর্ণগন্ধময় সত্তারহস্য তাঁর কাছে, এবং শুধুই তাঁর কাছে, উদ্‌ঘাটিত। প্রথম বয়সে এই প্রেম একেবারেই নিষ্কাম থাকে, সব কথার জন্য সব সময়েই দরজা খোলা, কোনোখানে কোনো বাধা নেই, কখনোই কাউকে উপেক্ষা করতে প্রাণ চায় না। তার ফলে কবিতার ক্ষতি হয়; তাতে শক্তির পরিচয়মাত্র থাকে, শক্তি সৌন্দর্যরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে না, কেননা সৌন্দর্য মানেই নির্বাচন, সামঞ্জস্য, বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে কবির বাক্‌প্রেমে কামগন্ধ ঢোকে, তখন আপন রচনাকে সৌন্দর্যদানের স্বার্থই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়, এবং সে-উদ্দেশে কথাগুলিকে সযত্নে সচেতনভাবে ব্যবহার করেন, প্রয়োজন হ'লে অত্যন্ত প্রিয় কোনো কথাকেও ঠেলে সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন না। কবিতা লেখার সময় মনের মহলে কত কথারই তো ঠেলাঠেলি ভিড়; তাদের ভিতর থেকে ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি তিনি বেছে নেন; এই বেছে নেয়াটাকে, এই সাজানোটাকেই আমরা আর্ট বলি। অন্য ভাবে বলতে গেলে, অল্প বয়সে কথাই কর্তা, কবি তার দ্বারা চালিত, পরিণত বয়সে কবি হন কর্তা, কথার অক্ষৌহিণী সেনানীর অধিনায়ক। প্রথম অবস্থায় কবিত্বের আভাসমাত্র পাই, দ্বিতীয় অবস্থায় কবিত্বের বিকাশ।

এই বারোটির যে-কোনো একটি কবিতা পড়লেই বোঝা যাবে যে ফাল্গুনী যথার্থ বাক্‌প্রেমিক। তাতে প্রমাণ হয় যে তিনি জাত-কবি। কিন্তু এই প্রেমে তিনি যে আত্মহারা, কথার তোড়ে তিনি যে গা ভাসিয়ে দেন, কোনোখানেই নিজেকে সংযত করতে পারেন না, এতে অবশ্য তাঁর তারুণ্যই সূচিত হয়। তারুণ্যের অনেক ক্ষমা আছে। বস্তুত অনেকখানি আতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়েই তারুণ্যকে গ্রহণ করতে হয়; ওটা জৈব লীলা, প্রকৃতির সৃষ্টিশালায় ওটা প্রয়োজন, ঐ অবস্থার ভিতর দিয়ে পার হ'য়ে তবেই মানুষ সুসম্পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছতে পারে।

এই কবিতাগুলির অগোছালো, এলোমেলো, অত্যন্ত-ঝংকৃত ভাষার উচ্ছলতা যে-প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করেছে, সেই প্রাণশক্তিকে শ্রদ্ধা করবো না, এত বড়ো বিজ্ঞ এখনও আমি হইনি। ফাল্গুনী রায় দীর্ঘজীবী হ'লে তাঁর কবিতার পরিণতি কোন পথে সম্ভব হ'তো তা নিয়ে জল্পনা ক'রে লাভ নেই, কিন্তু এখানে, উচ্ছ্বাসের ফেনিলতা সত্ত্বেও, যে-ভাবাবেগ ধরা পড়ে সেটুকু খাঁটি; কবির অন্তরে সত্যিকার অনুভূতি ছিলো, বলবার একটা কথা ছিলো, এবং কবিত্বের এটাই মূলধন। প্রথম যৌবনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবটা তীব্র হ'য়ে ওঠে, সেই তীব্রতাই এই কবিতাগুলির স্বাদ।

ফাল্গুনীর সাহিত্যিক গোত্রনির্ণয় করা শক্ত কাজ নয়। সত্যেন্দ্র দত্ত-নজরুল ইসলামের কাব্যাদর্শে তাঁর মন অভিভূত ছিলো; 'অমাবস্যা' ও

'কঙ্কাবতী'র লেখকের প্রভাবও চেষ্টা ক'রে খুঁজে বের করতে হয় না। অথচ মোটের উপর এটা মনে হয় না যে তিনি কারো অনুকরণ করেছেন। নবীন কবিদের উপর পূর্ববর্তীদের প্রভাব পড়বেই, তবু ফাল্গুনীর স্বকীয়তার এই ছোটো বইটিই যথেষ্ট প্রমাণ। তাঁর কবিতার দোষগুলি তাঁর নিজের— গুণগুলিও তা-ই। আর ভেবে দেখতে গেলে এই দোষ আর গুণ আলাদা জিনিশ নয়, একই বস্তু। কবিতাগুলি একান্তই স্বত-উৎসারিত ও স্বচ্ছন্দ, এবং সেইজন্যই উচ্ছৃঙ্খল; এদের পিছনে সচেতন গঠননৈপুণ্য নেই, আছে শুধু হ'য়ে ওঠাব, ফুটে ওঠার প্রেরণা। কাঁচা বয়সের এই যে নির্লজ্জ উল্লাস, এর একটা নেশা আছে। এই নেশা মস্ত কিছু নয়, কিন্তু তুচ্ছও নয়, এর স্বাদগ্রহণ করতে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। এ-কথা আমরা যেন না ভুলি যে 'মাতাল বাতাসে যা-তা-কথা-বলা দিন' আমাদের সকলেব জীবনেই আসে, যদিও কাবো জীবনেই স্থায়ী হয় না, কিন্তু এমন দুর্ভাগা কে আছে, জীবনের যে-কোনো অবস্থায় নবীন কবিব রচনাব ভিতর দিয়ে সেই দিনেব স্বাদ আবার নতুন ক'রে পেতে যার ইচ্ছা না করে?

১৯৪৩

সুকুমার সরকার

এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো আমাদের আর-একজন তরুণ মৃত কবির কথা, এ-কালের অনেক পাঠকের কানে যাঁর নামও হয়তো পৌঁছয়নি। 'কল্লোল'-যুগের যখন মধ্যাহ্ন সেই সময়ে সুকুমার সরকার তাঁর কবিতাব কলরোল তুলতে আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ-ছ' বছর ধ'রে নানা পত্রিকার ভিতর দিয়ে তাঁর কাব্যস্রোত অবিরাম প্রবাহিত হ'তে থাকে, যতদিন না জীবনের প্রথম অঙ্ক শেষ না-হ'তেই আকস্মিকরূপে নেমে এলো মৃত্যুর কালো যবনিকা। এ-স্থলে এই উপমার বিশেষ সার্থকতা আছে, কেননা এই তরুণ কবির জীবনের নাটকীয়তা উল্লেখযোগ্য—এবং শোচনীয়। আমাদের চাইতে বয়সে কিছু ছোটো ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনেব আশ্রম থেকে কলকাতায় এলেন কলেজে পড়তে—এবং অনিবার্যরূপে 'কল্লোল'-কার্যালয়েব পথ খুঁজে পেলেন। সেখানে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম, শ্যামল কোমল কিশোর মূর্তি, বড়ো-বড়ো চোখ, বড়ো-বড়ো চুল। শুনেছি, তাঁর স্বভাবে এমন একটি অনাবিলতা ছিলো যা তাঁর নাগরিক বন্ধুজনের কাছে তাঁকে অচিরেই

উপহাস্য ক'রে তুলেছিলো, এবং কিছুদিনের মধ্যে আপন স্বভাবের এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমি কল্পনা করতে পারি যে এই শেলি-উপাসক কল্পনাজীবী কবিকিশোরের দিনগুলি ক্রমে পাংশু থেকে পাংশুতর হ'য়ে উঠলো, রাত্রি মত্ত থেকে মত্ততর, তারপর বামাচারের বাঁকা পথে তিনি এতদূর অগ্রসর হলেন যে আমাদের অভ্যস্ত জগতে তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না। কখনো শুনি তিনি কোন বস্তিতে খোলার ঘরে বাসা নিয়েছেন, কখনো খবর পাই যে তাঁকে আত্মসাৎ করেছে কোনো-এক অভিনেত্রীর আত্মাকর্ষণ শক্তি—তারপর একদিন শোনা গেলো বসন্তরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নিতান্ত অনর্থক, একান্ত অকারণ মৃত্যু—কেননা আজকালকার দিনে বসন্তরোগে মরা আর আত্মহত্যা করা প্রায় একই কথা। তখনকার কলকাতার সাহিত্যিক সমাজের ফ্যাশানের অনুগামী হবার কর্তব্যবোধ এই আশ্রমলালিত বালককে এমনভাবে অভিভূত করেছিলো যে তাঁর জীবনযাপনের পথই তাঁকে পৌছিয়ে দিলো মৃত্যুর সিংহ-দরজায়: 'কল্লোল'-প্রবর্তিত বোহিমীয় হাব-ভাব রীতিভ্রষ্ট হবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটি বড়োরকমের মূল্য আদায় ক'রে নিয়ে গেলো তখনকার তরুণতম কবির প্রাণহরণ ক'রে। ইংরেজি সাহিত্যে যেটাকে 'নব্বুইয়ের' যুগ বলে, সে-যুগের কোনো সুরাক্লান্ত যক্ষ্মাক্রান্ত অকালমৃত অপ্রধান কবির সঙ্গে সুকুমার সরকারের তুলনা অপ্রতিরোধ্য।

অথচ এক হিশেবে এ-তুলনা অসার্থক, কেননা নব্বুই-যুগের ক্ষুদ্র কবিদের শুধু জীবনে নয়, রচনাতেও ছিলো ক্লান্তির কালিমা—যুগাবসানের, শতাব্দী-শেষের ম্লানতা। কিন্তু সুকুমার সরকারের জীবন যেমনই হোক, রচনায় শেষ পর্যন্ত ছিলো নবযুগের উল্লাস, আবিষ্কারের উৎসাহ, বিদ্রোহের সতেজ ভেরী-নির্ঘোষ। এগুলি অবশ্য সে-যুগের নবীন সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ: সুকুমার একান্তভাবে তাঁর যুগের দ্বারা অধিকৃত ছিলেন, 'কল্লোলে'র সাহিত্যিক আদর্শ তিনি যেমন চীৎকার ক'রে ঘোষণা করেছিলেন, তেমন আমরা কেউই বোধহয় করিনি। ফাল্গুনীর কবিতা সম্বন্ধে আগের পৃষ্ঠাগুলিতে যা লিখেছি, সুকুমারের কবিতা সম্বন্ধেও অবিকল সেই কথাগুলিই প্রয়োজ্য, তার সঙ্গে যোগ করতে চাই শুধু এইটুকু যে সুকুমারের কবিতা শেষের দিকে প্রবর্তিত হয়েছিলো তাঁর কেন্দ্রচ্যুত জীবন দ্বারাই: ড্রেন, ডাস্টবিন, ফুটপাথ, এই সব বিষয় অবলম্বন ক'রে প্রবল পদ্য-উচ্ছ্বাস তিনি উৎসারিত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ-সংক্রমণের বহু পূর্বে। তাঁর সে-সব রচনায় উচ্ছ্বাস ছিলো অত্যন্ত বেশি, কিন্তু কবিত্বও ছিলো। জীবনের শেষ ক-বছর যে-পরিবেশে, যে-নক্ষত্রের আধিপত্যে তিনি কাটিয়েছিলেন, তাতেও যে তাঁর কবিতা শেষ দিন পর্যন্ত দুর্বার বেগে নিঃসরিত হ'তে পেরেছে তা দেখে বুঝেছি যৌবনের সহনশক্তি অপরিসীম। আমার ধারণা, শুধু সাময়িক পত্রেই তাঁর

শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো—ছন্দোবদ্ধ সুদীর্ঘ বাক্‌বাহিনী!—অপ্রকাশিত রচনা ছিলো হয়তো ততোধিক। ফাল্গুনীর বন্ধু তাঁর 'বারোটি কবিতা' প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সুকুমারের সে-রকম বন্ধুভাগ্য দেখা গেলো না—আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হ'লো না গ্রন্থাকারে তাঁর কোনো রচনা, যদিও তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগের মাসেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হয়েছিলো 'মাতালের বাঁশি' নামে—কী ব্যঞ্জনাময়, কী যুগগন্ধী নাম! এই মাতালের বাঁশিকে বিস্মৃতির পাতাল থেকে এখনো কি কেউ উদ্ধার করবেন না? এই দিক্‌ভ্রষ্ট হতভাগ্য কিশোর কবি, যাকে বলা যায় 'কল্লোলে'র সর্বশেষ তরঙ্গ, তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে যাবে কি? তাঁর কাব্যের নিজস্ব মূল্য খুব বেশি যদি নাও হয়, তবু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তাঁর রচনা সর্বসাধারণের অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন মনে করি। এখনও সময় আছে, এর পরে হয়তো অত্যন্তই দেরি হ'য়ে যাবে।

১৯৪৩

নজরুল ইসলাম

১

আমার বাল্যকাল কেটেছে অজ মফস্বলে। দেশের বৃহৎ জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না—যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরি ক'রে এবং অনেক ক্ষীণ হ'য়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হ'য়ে বালক-মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফস্বলও থরথর ক'রে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশসুদ্ধু লোক যেন সব-খোয়াবার মন্ত্রে খেপে গেলো।

সে-সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না-হ'য়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহ'লে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারি গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোটো ছিলুম যে পিকেটিং ক'রে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিলো না আমার। যা-হোক কিছু একটা ক'রে উত্তেজনার ধারটাকে ক্ষইয়ে দেবার কোনো পথ আমার খোলা ছিলো না ব'লেই মনে-মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হ'লো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হ'লো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে—কী ভাগ্য! কী বিস্ময়!—একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে ব'সে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত প'ড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হননি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র খবর পাওয়া গেলো যে তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম-প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজী' এই জোড়া খেতাব বসানো হ'তো—তার মধ্যে প্রথমটি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টি বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরোলো মাসিকপত্রে—ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে-সব ভাগ্যবান কবিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম যে তিনি বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, 'কল্লোল'-'প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের স্রোত—যেন তা কখনো ক্ষান্ত হবে না, যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুর্মনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হ'লো যে তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি ক'রে ঢাকার ইতিহাসে একবারেই অনেকখানি কালিমালেপন ক'রে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো-বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট ক'রে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো- ক'রে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন-খোলা, সময়ের হিশেব-ভোলা—নজরুল যে-ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতি বারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের ময়লা, খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবার ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরি এনগেজমেণ্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে প'ড়ে, সবই করতে পারেন। একবার কলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হ'লো, না কি এমনি আশ্চর্য কিছু ঘটলো, ফূর্তির ঝোঁকে 'কল্লোল'-দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন—নজরুলকেও ধ'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু-দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে রমাতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সে-কালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন—মনে-মনে তাদের হিশেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তফা একবার ছড়া কেটেছিলেন—

> কাজী নজরুল ইসলাম
> বাসায় একদিন গিছলাম।
> ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
> হেসে গান গায় দিন রাত,
> প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়;
> ধরায় পর তার কেউ নয়।

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিক সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময় কই। নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান

গাওয়ানো কিছুই নয়।—গানে তাঁর আত্মা নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হ'লেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে-সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে-গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি-সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ-বাসি বাসরে আসিলে কে গো/ ছলিতে' 'নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া / পবান-পিয়া', এ-সব গান ঢাকায় লিখেছিলেন ব'লে মনে পড়ছে। এইমাত্র শেষ-করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে-শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধ'রে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম—ঢাকায় না 'কল্লোলে'র আড্ডায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশিদিন ধ'রে দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি, কলকাতায় এসে এখানে-সেখানে মাঝে-মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণশক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে আমাকে। সত্যিই তিনি যেন 'চির শিশু, চির কিশোর।' সম্প্রতি তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত হচ্ছিলাম—এইজন্যে ব্যথিত যে প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে ফলেনি, তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো বছর চারেক আগে—সেবার অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা-কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টিমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো—দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'I am the greatest yogi in India.' যোগসাধনা আরম্ভ ক'রে তাঁর গায়ের রং তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধ ঘণ্টা ব'সে ছিলেন—এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজরবন্দী হয়েছেন।

তার পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হ'য়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন—তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর জীবনে পরিণত বয়সের শান্ত সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর যদি তা না হয়, যদি এখানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার সমাপন ঘটে, তাহ'লেও, গেলো পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সংগীত বাঙালির মনে তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে।

আমরা যারা তাঁর সমকালীন, আমরা তাঁর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি, আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

২

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্ব-শক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সে-সময়ে তাঁর প্রভাব বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয়—কেনই বা থাকবে না—কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলো, স্বীকার করলো—তাঁর বই রাজরোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ ক'রে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো—অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা; কিন্তু যে-লেখা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকপ্রিয় হয় তাকে আমরা ঈষৎ সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ ইতিহাসে দেখা যায় সে-সব লেখা প্রায়ই টেকসই হয় না। নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি—তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই পলকের জন্য এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এ-সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাততালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।

নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি, এবং এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে তিনি হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো, তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে-আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ মাত্র সে-খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি—অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধুই হৈ-চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে—একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে রুদ্ধস্রোত। গদ্যলেখক হ'য়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।

অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ—এবং প্রধান দোষ। যা-কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে, ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। সম্পাদক-বন্ধুরা কিছুতেই লেখা আদায় করতে না-পেরে কাগজ, কলম, চা ও পান দিয়ে তাঁকে একটা ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছেন—ঘণ্টাখানেক পরে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ একটি কবিতা। আশ্চর্য ক্ষমতা সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় এতে কাজ হয় না, আর যখন হয় না তখন ফল হয় খুবই খারাপ। এ-ক্ষমতা চমকপ্রদ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এদিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে—সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। বায়রন সম্বন্ধে গ্যেটে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য : 'The moment he thinks, he is a child.'

'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর'—এ-কথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধ'রে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'লো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না। প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে; রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে যেমন বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় যে তাঁর প্রতিভা 'ধনী, কিন্তু গৃহিণী নয়'। যে-সম্পদ নিয়ে জন্মেছিলেন তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্যকর্মে এখনো হ'লো না, সেখানে দেখতে পাই তাঁর আত্ম-অচেতন মনের অনেক হেলাফেলা, অনেক ফেলাছড়া, অনেক অপচয়।

গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে—চলতি ভাষায় যাকে 'স্বদেশী গান' বলে—রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান, এবং সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর—গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারেনি—'বুলবুল' ও 'চোখের চাতকে' কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ। কত গান সুন্দর আরম্ভ

হয়েছে, সুন্দর চ'লে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো-একটা অমার্জিত শব্দপ্রয়োগে সমস্ত জিনিশটিই গেছে নষ্ট হ'য়ে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল ; কিন্তু তার আবেদন আমাদের মনে যখনই ঘন হ'য়ে আসে তখনই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোনো স্থূল স্পর্শে মোহ ভেঙে যায়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো—শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হ'তো, তাহ'লে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হ'লো।

শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি—পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান রচনা করেননি। কথাটা অসম্ভব নয়—শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন ক'রে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান—সব রকম। সে-সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ; সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমনকি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। আর বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা তাঁর কবিতায় আছে সেই শক্তি, যাকে দেখামাত্র কবিত্বশক্তি ব'লে চিনতে ভুল হয় না।

১৯৪৪

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

• ১২৯৪-১৩৬১ বঙ্গাব্দ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আঁধারি সময়, যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানলায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হ'য়ে আছে পুরোনো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতাময় অভ্যাস।

সব ক-টা জানলা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন, তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুলের ছিলো দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জ্বলতম সেতু ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই শতকের তৃতীয় দশকে যে-কবিরা যুবক কিংবা কিশোর ছিলেন, তাঁদের নতুন কাব্য ইঙ্গিত পেয়েছিলো আরো দু-জন অগ্রজ সমসাময়িকের কাছে: তাঁরা মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মোহিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত 'বিস্মরণী' যখন বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা' দুটোই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'কল্লোলে'র অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হ'য়ে শুনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে-চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব ক'ষে গোরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুর।

যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চ'লে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে-তিন মাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ছন্দেরই একটি নির্দিষ্ট, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গ'ড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র কবিতাবলি।

আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, বেশ-তোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা')—বিরল ব'লেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়ত, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন।

যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভয় দেহাত্ম-বোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিক থেকে যেন একটা নিশ্বাস ফেলা নিষ্কৃতি ছিলো যতীন্দ্রনাথের সরল, বৈঠকী দুঃখবাদে। সৃষ্টির আনন্দময় অভিনন্দনে আবাল্য অভ্যস্ত আমরা, সেই প্রথম শুনলুম ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ। 'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য, মন্দ যদি সাতচল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন'—এর একেবারে বিরুদ্ধ কথা ব'লে যতীন্দ্রনাথ আমাদের মনোহরণ করলেন—

বন্ধু বন্ধু গো,
ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহি তায় সন্দেহ।

স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন তাঁর অবিশ্বাস—

ঈশ, মুশা আর বুদ্ধ
কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে যিনি ভগবান
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
র'বে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল,
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল।
কি হবে কথার ছল?
ভগবান চান—তবু হয় না'কো, এ-কথা পাগলে বলে।

কথাটা উপাদেয় সন্দেহ নেই, হঠাৎ অকাট্য ব'লেও মনে হ'তে পারে, কিন্তু এ থেকে কোনো গতিশীল চিন্তার যে সূত্রপাত হ'তে পারে না সে-কথা অবশ্য না বললেও চলে। মানুষের জীবনে বা বিশ্ববিধানে দুঃখ জিনিশটা ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেটা দেখতে হ'লে আর্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, কবির মধ্যে সেটা সব সময় আশা করাও সংগত হয় না। সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিলো রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়, আর সে-প্রভাবও ক্ষণিক ও অদূরস্পর্শী। এতেও বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিলো—অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, শ্রান্তিহারক রমণীয়তা। তাঁর রচনার প্রথম প্রকাশকালে সেই লেখকই প্রশংসনীয় ছিলেন, যিনি রবীন্দ্রনাথের 'মতো' লিখতেন না, অতএব আজকের দিনের পাঠককে বুঝিয়ে বলা শক্ত হ'তে পারে, আমাদের যৌবনকালে তাঁর কবিতা কেন আমাদের ভালো লেগেছিলো।

১৯৫৪

কালের পুতুল

যাকে আমরা মতামত বলি সে-জিনিশটা অত্যন্ত অস্থির। তার উপর নির্ভর করতে ভয় হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বস্তুর ক্ষেত্রে যে মতবদল হয়, কোনো-একটা তথ্যে তার ভিত্তি থাকে ব'লে তার তবু একটা দিশে পাওয়া যায়, কিন্তু রসের জগতে কখন যে কোনদিক থেকে হাওয়া দেয় তার কিছুই বলা যায় না—ভাবখানা এইরকম যেন সমস্তটাই একটা বিশুদ্ধ খামখেয়াল। যেদিন প্রথম জানা গেলো যে আমাদের দৈহিক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীটাই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেদিন বিজ্ঞানের মতামতগুলি বাক্সবন্দী হ'য়ে বাসা-বদল করেছিলো, এবং পরবর্তী যুগে এই রকম বদলের পালা আরো কয়েকবার ঘটেছে। নূতন তথ্য আনে নূতন মত, মেনে নিতে কোথাও বাধে না। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে যুক্তির, গণিতের, পরীক্ষার সারি-সারি প্রমাণ-সৈনিক। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কিছুই প্রমাণ করবার নেই। চৈত্রের দুপুরে যে-কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম, কোনো-এক শ্রাবণের বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে সে-কবিতা বোবা হ'য়ে রইলো। অবসরের শান্ত অপরাহ্নে যে-লেখা মনকে ছুঁতে পারলো না, কোনো-এক উদ্ব্যস্ত বেলা-দশটায় ট্র্যাম ধরবার জন্য ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ তারই দুটি লাইন মনে প'ড়ে দাঁড়াতে হ'লো থমকে। এ-রকম কেন হয় তার ব্যাখ্যা নিয়ে একদিকে মনোবিজ্ঞানী আর-এক দিকে সমাজশাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন—কিন্তু সে-সব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস কী। আর তার সার্থকতাই বা কোথায়। আমাদের ভালো-মন্দ লাগার এই বিকম্পনের বেগ কিছুতেই তো রুদ্ধ হবে না। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় কত খ্যাতির মুকুট ধুলোয় লুটিয়েছে, কত অজ্ঞাত নাম পরবর্তী যুগের মানসপটে প্রতিভাত হয়েছে উজ্জ্বল হ'য়ে। আজ যাঁর জয়ধ্বনি দিতে-দিতে জনতার গলা ভেঙে যাচ্ছে, কাল দুয়ো দেবার জন্যও কেউ স্মরণ করে না তাঁকে; আর আজ যাঁর দিকে ফিরেও তাকালো না, কাল তাকেই অভিষিক্ত করে সিংহাসনে। শুধু কি তা-ই। সাহিত্যাকাশের জ্যোতিষ্ক ব'লে যাঁদের চিনেছি, যুগে-যুগে তাঁদেরই খ্যাতির কী বিস্ময়কর উত্থান-পতন। মানসিক বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁরাও কখনো উজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। ড্রাইডেন ফিরে এসেছেন, শেলি গেছেন স'রে—কিন্তু শেলির দিন আবার আসবে—তখন শেলিঘাতক এলিঅটের কী-দশা হবে কে জানে। যে-সব লেখক বহুকাল ধ'রে বহু লোকের মনে বিরাজ করেছেন, রুচির অনিশ্চয়তা তাঁদেরই নিয়ে যখন নৃত্য করে, তখন যাঁরা সদ্যোজাত, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে

এই সংশয় উঁকি দেয় যে দু-দিন পরেই হয়তো উপহাসের উচ্চহাসিতে সে-কথার অপঘাত ঘটবে। 'আর্চবিশপ' টি. এস. এলিঅটও যখন সমসাময়িক সাহিত্যবিচারে মারাত্মক ভুল করেন, তখন অন্যে পা বাড়াবে কোন সাহসে।

পা বাড়াতে সাহস পান না অনেকেই। পণ্ডিতেরা, অধ্যাপকেরা সমকালীন সাহিত্যকে তাঁদের অনুশীলনের বহির্ভূত রেখে নিরাপত্তা খোঁজেন। আর সংবাদপত্রাদিতে রিভিউ লেখেন যাঁরা, তাঁরা এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নিরঙ্কুশ এবং—দুঃখের বিষয়—সাধারণত সবচেয়ে নির্বোধ। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি এ-বিষয়ে একটি নীরক্ত নেতিবাচক দুর্নীতিকে আশ্রয় করেছেন—কোনো বই সম্বন্ধেই মন্দ বলেন না তাঁরা, এবং কোনো বই সম্বন্ধেই কিছু বলেন না। বাকি রইলেন লেখকসম্প্রদায়—এঁদের ভালো-মন্দ লাগার তীব্রতা ভীরুতা হরণ করে, এবং সাহিত্যরচনায় বহুদিনের অভ্যাস আত্মবিশ্বাস আনে, তাই দেখা যায় যে সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যা-কিছু কথা বলা হয়েছে তার বেশির ভাগ বলেছেন লেখকরা নিজেরাই। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত করলেন বঙ্কিম, তারপর রবীন্দ্রনাথ—প্রথম ও মধ্য বয়সে হয়তো স্বেচ্ছায়, শেষ বয়সে হয়তো অনুরুদ্ধ হ'য়ে—নতুন-নতুন লেখক ও গ্রন্থ উপলক্ষ্য ক'রে অনেক কথাই বলেছেন। সমকালীন রচনাকে ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাওয়া যে অসম্ভব আর ভ্রান্তির আশঙ্কা যে পদে-পদে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বার-বার আলোচনা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে 'সমালোচনাকেই সাহিত্য ক'রে তোলা।' এ-প্রসঙ্গে আর-একটি সুন্দর কথা তিনি বলেছেন, সেটি এই যে 'আমাদের মনে রূপ ও রসসৃষ্টির যে আদর্শ আছে, নিজের রচনা দ্বারাই সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা শ্রেয়, অন্যের রচনার বিচারের দ্বারা নয়।' ঠিক; এর চেয়ে সত্য আর কী। একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার। কিন্তু সে রচনা যার অভিসারে বেরোবে তার মনও প্রস্তুত থাকা চাই তো। সেইজন্য উদাহরণের সঙ্গে-সঙ্গে উপদেশও চাই, আলোচনার ভিতর দিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শের অভিব্যক্তি চাই, যাতে সে-আদর্শ লোকচিত্তে সুস্পষ্ট হ'তে পারে। সেখানেই সমালোচনার সার্থকতা। সমালোচনা ভালো-মন্দ বাছাই করতে শেখায়, সে-শিক্ষা যত বেশি লোক যত ভালো ক'রে নিতে পারবে, ততই সাহিত্যে মন্দ ক'মে গিয়ে ভালোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।* সমালোচনার একটি

*এই উক্তিটিকে খণ্ডিত না-ক'রে ছেড়ে দিতে পারছি না; সমালোচনা পরিণত হ'লে কী হয়, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে; স্থাপিত হয় সাহিত্য ও অসাহিত্যে (বা জনতার সাহিত্যে) কঠিন ব্যবধান; ইংলণ্ডে একই ব্যক্তি ডি এইচ. লরেন্স ও এথেল এম. ডেল-এর উপন্যাস পড়েন না,

সুদৃঢ় উজ্জ্বল আদর্শ পরিণত সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বাংলা সাহিত্য অপেক্ষাকৃত নবীন ব'লে সে-রকম কোনো সজীব সক্রিয় আদর্শ এখনো অনুভূত হচ্ছে না—সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে সেটা একটা অন্তরায়। সেই বাধা দূর করার একটা প্রত্যক্ষ উপায় হ'লো অন্যের রচনার বিচার করা। আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ—ইচ্ছায় হোক, অনুরোধে হোক—সমসাময়িক সমালোচনায় অসংখ্য বার অবতীর্ণ হয়েছেন, আর সেই সমালোচনাকে সাহিত্য ক'রে তুলেছেন প্রতি বারেই—কী প্রবন্ধে, কী ভাষণে, কী পত্রে। এই ভাবে, শুধু সাহিত্যকলাতেই নয়, সমালোচনা-শিল্পেও তাঁর কাছে যে-শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা ব্যর্থ হবে এ-কথা কিছুতেই মনে করতে পারি না; কালক্রমে আমাদের সমালোচনাতেও সুস্পষ্ট আদর্শজনিত শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই দেখা দেবে। এ-কথা মনে করবার আরো বেশি কারণ এই যে সাহিত্যে ভালোর উদাহরণ যত বেশি পাওয়া যায় উপদেশের দীপ্তিও সেই পরিমাণে বাড়ে—বর্তমানে বাংলা ভাষার আলোচনাযোগ্য রচনা অত্যন্ত বেশি বিরল নয়।

সমালোচনাকেই সাহিত্য ক'রে তুলতে পারলে মস্ত একটা সুবিধে এই যে পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি না-ও হয়, সাহিত্যরসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে মনকে নাড়া দেবে সুন্দর, তাই কোনো কালেই তা ব্যর্থ হবে না। সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব সমালোচনা অমর হয়েছে তাতে যে সব সময়েই একেবারে নির্ভুল মতামত ছিলো তা নয়, ছিলো সেই পরিমাণে রচনার সৃষ্টতা যাতে তারা সাহিত্যের গৌরব ব'লে স্বীকৃত হ'তে পেরেছে। যেহেতু সমালোচনা ভাষায় লেখা হয়, পরিভাষায় নয়, সেহেতু এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে সমালোচনা বিজ্ঞান নয়, শিল্প; অতএব সমালোচকের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভাষাশিল্পী হওয়া। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক আলোচনা পাওয়া যায় যাতে ভালো-ভালো তত্ত্বকথা থাকে, থাকে না রূপ, থাকে না রস—সে-সব লেখার সর্বশেষ সমাধি ঘটে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে, অথচ অস্কার ওআইল্ড পরিহাস-ছলেও যে-সব কথা বলেছিলেন তার রূপের উজ্জ্বলতা মানুষ কিছুতেই ভুলতে পারছে না, প্রতিবাদ করবার জন্যও বার-বার আবৃত্তি করছে।

কিন্তু মেঘের আকৃতির মতো মতেরও যদি ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন ঘটে, তাহ'লে যাকে সমালোচনা-শিল্প বলছি তার মূল্য কোথায়? অর্থহীন কথা

ও-দুই যে ভিন্ন জাতীয় রচনা, সে-বিষয়ে সকলেই সচেতন। কিন্তু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'লেখক', বর্ণমালার দ্বারা প্রস্তুত ঝাল-চাটনির পরিবেশকও তা-ই। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ভালো ও মন্দ সাহিত্যের পরিমাণ যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য—এবং তুলনায় মন্দের পরিমাণ বহুগুণে বেশি হবেই, আসল কথাটা হ'লো ও-দুয়ের প্রকৃতি বিষয়ে নির্ভুল ও ব্যাপক ভেদজ্ঞান। এই মূল্যবোধেই সমালোচনার সাধুতা; তার 'মতামতে' অত্যন্ত বেশি এসে যায় না।—দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা।

দিয়ে ছন্দ সাজালে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি সমালোচনা-রচনার রূপটাও তো নির্বস্তুক নয়, তার আন্তরিক বস্তুতেই তার রূপের মূল্য। যদি স্বীকার ক'রে নেয়া যায় যে কোনো মতই কখনো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে না, তাহ'লে সমালোচনার মর্যাদা অনেকটা ক'মে যায় না কি? কিন্তু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য বিচিত্র মতামতের সংঘর্ষ, রুচির অশ্রান্ত জঙ্গমতা—এই সমস্ত অতিক্রম ক'রে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের আনন্দচেতনায় কিছু-একটা চিরন্তন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা কিছুই সম্ভব হ'তো না, থাকতো শুধু খবর, থাকতো শুধু তত্ত্ব। যে-খবর একবার শুনলে আমরা আর ভুলতে পারি না, বার-বার শুনতে চাই, এবং বার-বার শুনেও যা পুরোনো হয় না, তাকেই বলি সাহিত্য, বলি আর্ট। যে-শক্তিতে খবর হ'য়ে ওঠে গান, অনুকৃতি হ'য়ে ওঠে ছবি, সেই শক্তি বিকীর্ণ হয় যে-উৎস থেকে, সে তো স্থান-কালের প্রভাবের অতীত, উপকরণের পরিবর্তনে তার কী এসে যায়। সে-শক্তি আনন্দেরই শক্তি। মানুষের আনন্দচেতনায় একটি আদিম অকলুষেয় নির্বিকারতা আছে ব'লেই তার শিল্পকলা ও সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি সুগভীর ঐক্য ধরা পড়ে, একটি নিরবচ্ছিন্ন ছন্দ। তা-ই যদি না হবে, যদি সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি বিশ্বব্যাপী নিত্যতা না থাকবে, তাহ'লে পুরাকালের বাল্মীকি কেন আনন্দ দেয় আমাদের, বিদেশী ফাউস্ট কেন আমাদের কাছে জীবন্ত, চীনে কবিতার কয়েক লাইন অনুবাদ কেন আমাদের মনকে মন্থন করে।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র ৪৬ নম্বর চিঠিতে বর্তমান কালের বাংলাদেশে বঙ্কিমের খ্যাতির অবক্ষয় উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা উত্থাপন করেছেন। 'ভালোমন্দ লাগার আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে মানস-সৃষ্টির উদ্যম চলেচে, সে মায়ার সৃষ্টি।··· কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলচেই, আজ সেই দৃষ্টির যে সব উপকরণের যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েচে, এবং এত স্পষ্ট হয়েচে ব'লেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত, কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক ওদিক হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী ক'রে। একেই বলতে হয় মায়া। এই মায়ার উপরে দাঁড়িয়ে কত গাল মন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত। অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারিনে, না থাকলে মানবসমাজ হোত প্রকাণ্ড একটা পাগলা গারদ।' এই 'নিত্যতার বন্ধনে'ই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। কখনো-কখনো মানবসমাজকে পাগলা গারদ ব'লে মনে হ'তে পারে না নয়, কিন্তু আরো তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে আমরা শুধু যে যার কুঠুরিতে ব'সে চীৎকার ক'রে পরস্পরের কণ্ঠস্বর ডোবাচ্ছি না; শুধু ভেদ নয়, তর্ক নয়, শুধু পরিবর্তনের

বিক্ষেপ নয়, মানুষের মনে মিলনের এমন একটি ক্ষেত্র আছে যা কখনো-কখনো ঝাপসা হ'য়ে এলেও কখনোই লুপ্ত হয় না। সেই ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিজেকে প্রয়োগ করে, তার পটভূমিকা চিরন্তন, তাই সে সার্থক ও শ্রদ্ধেয়।

তাছাড়া, সমালোচনার কাছে শেষ কথা যদি কখনো আশা করি তাহ'লেই আমরা ভুল করবো। সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনো বলতে পারেনি, বলতে পারে না। কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রবর্তনা ক'রে সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছে বার-বার, বার-বার সে-চেষ্টা ব্যর্থ করেছে নবীন জীবন্ত সাহিত্যের অভাবনীয়তা। যাকে exact science বলে সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত, এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটির কথা। কবিতা কী, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না—কিন্তু অনেকগুলি উত্তর পাশাপাশি সাজালে হয়তো সবগুলিতেই সত্যের আভাস পাওয়া যাবে। সত্যের আভাস এখানে যথেষ্ট ব'লে দুটি বিপরীত কথা একই সঙ্গে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে আমাদের বাধে না, বিজ্ঞানের জগতে যা অসম্ভব। যাঁদের রচনায় সত্যের আভাস বার বার পাওয়া যায় এবং উজ্জ্বলভাবে পাওয়া যায়, সমালোচক হিশেবে তাঁরাই আমাদের নমস্য। তাঁদের মতামতের দেহ কালের দংশনে জীর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে সত্যদৃষ্টির যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে তা ম্লান হয় না।

এই বইয়ে আমার সমকালীন কয়েকজন বাঙালি কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনাগুলিতে আমার উৎসাহ, আমার অনুরাগ, আমার শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। আমার প্রথম যৌবনের নিকুঞ্জে, আমার পরিণত যৌবনের প্রান্তরে নব-নব যে-সব কবি আনন্দের আন্দোলন তুলেছিলেন, এখানে রইলো তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার নিবেদন। ভালোবাসার মতো সুন্দর আর-কিছুই নয়, আর ভালোবাসা জানাতে যত ভালো লাগে, তত ভালো আর-কিছুই লাগে না। অনেকে বলেন, সমালোচককে নিরপেক্ষ হ'তে হবে, এমন কথাও শুনেছি যে সমালোচনায় কিছু নিন্দার অংশ অপরিহার্য। এ-সব কথা আমি বুঝতে পারি না। অনুরাগই তো সেই আগুন, যাতে মনের শিখায় আলো জ্বলে—আর অনুরাগের মতো পক্ষপাতী আর কী। নিন্দাই যে নিরপেক্ষ তা তো নয়, সেটা বিপরীত-পক্ষপাত মাত্র, অথচ আশ্চর্য এই যে বাংলাদেশে নিন্দা করলে সাধুতার জন্য বাহবা পাওয়া যায়। 'দেখেছো! কেমন ঠিক কথা বলেছে লোকটা!' যেন মন্দ কথা সব সময়েই সত্য, আর ভালো কথা অভ্রান্তরূপে ভ্রান্ত। সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উন্মীলন, সাহিত্যের বড়ো

একটা পটভূমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত ক'রে, এবং নিজের উৎসুক চিত্তকে প্রকাশ ক'রে, পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক। এ-কাজে উত্তাপ চাই, উৎসাহ চাই, নিন্দার ঠাণ্ডা সংকীর্ণতা দিয়ে তা সাধিত হ'তে পারে না।

সমালোচনাকে যাঁরা বিজ্ঞানের ক্লাশে ভরতি করাতে চান তাঁরা বলবেন যে যুক্তির তবু একটা স্থিরতা আছে, কিন্তু ভালোবাসা তো একটা আবেগ, আর আবেগ একটা কম্পন, একটা তরঙ্গ, স্বভাবতই ভঙ্গুর ও চঞ্চল, তার উপর মুহূর্তের জন্যও কি নির্ভর করা যায়। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়—এই প্রবন্ধগুলিতে যা লিখেছি আমিই যে আমার বার্ধক্যে তার সব কথা সমর্থন করতে পারবো তারই বা নিশ্চয়তা কী। ভাবীকালের কথা যদি ভাবি, আমার অনেক কথাই পরবর্তী কালে সমসাময়িক মোহাচ্ছন্নতার উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারে, সে-সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবু এও বলি যে সেটাকে যদি মাত্র সম্ভাবনা ব'লে না-জানতুম—তার বেশি না—তাহ'লে প্রবন্ধগুলি লিখতেই পারতুম না। আমি যা লিখেছি আমার কাছে তা সত্য, এবং অন্যের মনেও সেটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হোক, এই ইচ্ছার প্রেরণা না-থাকলে লেখাই বা কেন। আমার কথা লোকে গ্রহণ করবে না, আমি নিজেই হয়তো কোনোকালে অস্বীকার করবো, এ-কথা মনে করা মানে নিজেই নিজের মৃত্যুকামনা করা—সেটা প্রাণধর্মের বিরোধী। আর সে-কথাই যে সত্য তাও তো নয়। মানুষের জীবনে ভিন্ন-ভিন্ন বয়সে ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গি প্রবর্তিত হয়, কিন্তু মূল স্বর একই থাকে, 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত একই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায়। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মনের উপাদানগুলির পরিমাণ-সংস্থানের পরিবর্তন হয়, কিন্তু উপাদানগুলি মৌল, তারা যা তারা তা-ই—সোনা কখনো রুপো হয় না, শিষে হয় না রুপো। সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটাকে নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালাতে পারলে দুঃখিত হতেন না, কিন্তু চালাবার উপায় তাঁর কোথায়, ওরই মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ছিলো 'মানসী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা'। ভাষা আয়ত্ত করতে সময় লাগে, আর ভাষা যখন পর্যন্ত ভালো ক'রে আয়ত্ত হয়নি সে-অবস্থার রচনা লেখক পরবর্তী জীবনে যদি বর্জন করতে চান সেজন্য তাঁকে দোষ দেয়াও যায় না, কিন্তু তার মানে এ নয় যে সে-সব কাঁচা লেখায় তাঁর সেই মনই প্রতিফলিত হয়নি, যে-মন থেকে তাঁর পরিণত রচনাবলি উৎসারিত হয়েছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের রচনাশক্তি বাড়ে, কিন্তু প্রাণনশক্তি বাড়ে না; চিন্তা বেশি সুশৃঙ্খল হয়, কিন্তু চিন্তার চরিত্র বদলায় না। পরবর্তী জীবনে আমার এই রচনাগুলিতে এখানে এক লাইন বাদ দিয়ে ওখানে এক লাইন বসাতে ইচ্ছা হ'তে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্যকেই বর্জন করতে চাইবো সেটা সম্ভব মনে হয় না। আর ভাবীকাল?

সন্নিকট ভাবীকাল যদি প্রত্যাখ্যান করে, দূরের ভাবীকালে আবার হয়তো ফিরে আসবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা বিরল নয়।

২

আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম, সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে আজ ঈষৎ সংকোচ বোধ করছি। সংকোচ এইজন্য যে আধুনিক কথাটার সংজ্ঞার্থ যুগে-যুগে বদলায়, অভিনবত্বের আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী, এবং সবশেষে বিচারে বোধহয় এ-কথাই বলতে হয় যে সেইটেই সত্যিকার আধুনিক, যেটা চিরন্তন। সেই চিরন্তনকে চিনবো কেমন ক'রে, এটাই সমালোচনার চরম প্রশ্ন, যে-প্রশ্নের উত্তর নেই। হাত বাড়ালেই অতীতের সাহিত্যমঞ্চ থেকে চিরন্তনের উদাহরণ পাকা ফলের মতো টুপ ক'রে পড়তে পারে, কিন্তু সমকালীন সাহিত্যের অবান্তরতা-ভারাক্রান্ত নিষাদ-নিনাদের ভিতর থেকে চিরন্তনের সূক্ষ্ম সুরটি প্রত্যেক বারই একেবারে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারেন, এমন আর্য শ্রুতিশক্তি কোনো মানুষের কি হওয়া সম্ভব? কালের এক নিশ্বাসে কোনো-একটা জিনিশ অত্যন্ত স্ফীত ও উজ্জ্বল হ'য়ে আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে, আর-এক নিশ্বাসে কিছু-না হ'য়ে মিলিয়ে যায়—তখনই, শুধু তখনই, আমরা বুঝতে পারি যে ওটা বর্ণিল বুদ্বুদ মাত্র—আর এটি দুই নিশ্বাসপাতের মাঝখানে কেটে যায় মানবজীবনের এক যুগ। আবার কত জ্যোতিষ্ক চলন্তিকালের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ভাবীকালের অপেক্ষা করে। আমাদের সাহিত্যরচনা, আমাদের সাহিত্যবিচারের প্রচেষ্টা নিয়ে কাল যে-বিচিত্র নৃত্যের আয়োজন করে, তার মতো নিশ্চিত, তার মতো অনিশ্চিত আর-কিছুই নয়। সে-কথা ভেবেই এ-বইয়ের আমি নাম দিয়েছি 'কালের পুতুল'। এই প্রবন্ধগুলির প্রথম রচনাকাল আর গ্রন্থাকারে তাদের প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান মাত্রই পাঁচ-দশ বছরের, অথচ এরই মধ্যে সেই খেলার একটুখানি আভাস যেন দেখা যাচ্ছে, যে-খেলা নিরন্তর খেলছে জীবনপুতুলি নিয়ে কালের অদৃশ্য হাত। সে-সময়ে বাংলা কবিতায় নতুন আশা এসেছিলো, নতুন উদ্দীপনা: বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী—পর-পর নূতন কবিদের অভ্যুদয়ে আমরা চকিত হয়েছিলাম। নতুন সুর এনেছিলেন তাঁরা, নতুন ছন্দ, নতুন ভাষা। আশা আমাদের আকাশ স্পর্শ করেছিলো। আজ যখন বিস্ময়ের সেই রোমাঞ্চন কেটে গেছে, অভিনবত্বের দৌবারিককে পার হ'য়ে যখন রসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি, আজ জিজ্ঞাসা করার সময় এসেছে—সে-আশা কি পূর্ণ হয়েছে আমাদের? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এই দু-জনের মধ্যে কোনোদিকেই

কোনো মিল নেই—কিন্তু সম্প্রতি এই একটি শোকাবহ সাদৃশ্য ধরা পড়ছে যে দু-জনেই কবিতা লেখা বন্ধ করেছেন। তবু সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা কবিতার বই আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী হবে, কিন্তু ঐ এক টুকরো 'পদাতিক' হাতে ক'রে সুভাষ কি মহাকালের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন? জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে আজ সেই কথাই বলা যায়, যে-কথা এই পুস্তকে তাঁর বিষয়ে লিখতে গিয়েই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে বলেছি: তিনি আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে আজ বন্দী। আর সমর সেন সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয় যে অত্যন্ত তরুণ বয়সে অত্যন্ত পরিণত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি কি যৌবনের পরিপূর্ণ ঋতুতেই নিঃশেষিত হ'য়ে গেলেন? এই গ্রন্থে আলোচিত কবিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের উৎসাহ এখনো অব্যাহত আছে শুধু অমিয় চক্রবর্তী আর বিষ্ণু দে-র। কিন্তু সাম্যবাদে দীক্ষা নেবার পর থেকে বিষ্ণু দে যেন স্বেচ্ছায় পরিহার করছেন তাঁর সেই নৈপুণ্য, যা ছিলো তাঁর মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয়, ওদিকে নিশিকান্ত, শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের প্রভাবে, তাঁর কবিত্বশক্তিকে অবরুদ্ধ করেছেন পারিভাষিক আধ্যাত্মিকতার গণ্ডির মধ্যে।*

মোটের উপর, সে-উৎসাহ এখন আর নেই, সে-উদ্দীপনা আর নেই। এমন কোনো নতুন কবি এখনও দেখা দিচ্ছেন না, যাঁর শক্তির স্বকীয়তা স্বয়ংপ্রকাশ। তরুণতরদের মধ্যে অনেকেই নিয়ে আসছেন সবপূর্বতীর চরণে তাঁদের প্রচেষ্টার উপচার, তাঁদের সদিচ্ছার অঞ্জলি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা নীরক্ত পাংশুতার ছায়া তাঁরা কিছুতেই যেন এড়াতে পারছেন না। এ-রকম হবার কারণ কী, তা নিয়ে তাঁরা নিজেরাও ভাবছেন, অন্যেরাও ভাবছে। অনেককেই খুব সহজে বলতে শুনি, এর কারণ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিশ্ব-সংকট, ভারতীয় জাতি-জীবনের বর্তমান বৈকল্য। কোনো-কোনো কবির মুখেও শুনেছি এ-কথা। কিন্তু শুধু বাইরের দিকে তাকালেই চলবে কেন, নিজের ভিতরেও তাকাতে হবে। মনের মধ্যে বাণীর আন্দোলন তেমন প্রবল বেগে যদি উপস্থিত হয়, কিছুই কি তাকে থামাতে পারে? কবিতার শক্তির মধ্যে একটি আবশ্যিকতা আছে, সে নিজেই নিজেকে লিখিয়ে নেয়, না-লিখে উপায় থাকে না কবির। কবিতার সেই অনস্বীকার্য প্ররোচনা কবিদের মনে আজ যদি না জাগে, আর তার কারণ যদি যুদ্ধ ব'লে, দুর্ভিক্ষ ব'লে ঘোষণা করা

* এই মন্তব্যগুলি লেখা হয়েছিলো ১৯৪৫-এ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালে, এবং সেই সময়ের পক্ষে এগুলি অসংগত ছিলো না। কিন্তু ইতিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সংবর্ত', 'প্রতিধ্বনি' ও 'দশমী', জীবনানন্দ দাশের সর্বশেষ ও চরিত্রবান পর্যায়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং—কোনো-কোনো কবি কবিতাকে ত্যাগ ক'রে থাকলেও—উল্লেখযোগ্য আরো দু-একটি ঘটনা ঘটেনি তাও নয়। আজ, ১৯৫৮-র অন্ত্যকালে, এ-কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে আধুনিক বাংলা কবিতা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।—দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা।

হয়, সেটা এক রকমের আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কী। কেমন ক'রে বলি যে যুদ্ধ এর কারণ, দুর্ভিক্ষ এর কারণ, যখন মনে-মনে জানি যে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ কবিতার প্রেরণার বাধা হ'তে পারে না, এমনকি নিজেরাই প্রেরণা হ'তে পারে? কিন্তু সংঘবদ্ধ হ'য়ে, প্রতিজ্ঞা ক'রে বা নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে যে প্রেরণা আসে না, আজকের দিনের তরুণ বাঙালি কবিরা এই কথাটিই যেন ভুলতে বসেছেন। সমকালীন ঘটনার উপর ভাষ্য রচনা ক'রে তাঁরা যেন একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করছেন, তার ফল হয়েছে এই যে যদিও বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন বিষ্ণু দে বা একজন অন্নদাশঙ্কর কখনো-কখনো সাংবাদিকতাকে অবলম্বন ক'রে কবিতা রচনা করতে পেরেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতা অধঃপতিত হচ্ছে সাংবাদিকতায়। বহুকে নিয়ে ঘটনা, কিন্তু কবিতা একজনের সৃষ্টি। কবির সেই নির্জন মনোমণ্ডলে কখন কোন ঘটনা ঢেউ তুলবে, বা তুলবেই কিনা, তা কেউ বলতে পারে না। সদিচ্ছা থেকে, কর্তব্যবোধ থেকে সেখানে কিছু হয় না, নিজেকে শুধু প্রস্তুত রাখতে হয়, যাতে মনের সংস্পর্শে আসতে-আসতে বহির্বিশ্বের আলোড়নের পিণ্ড থেকে সেই বৃহৎ দেহময় অংশটা ঝ'রে যায়, যে-অংশ সাময়িক, স্থানীয় ও পরিবর্তমান, থাকে শুধু ভাব, সুর, কম্পন। এই প্রস্তুত হওয়া, এই প্রস্তুত থাকাটাই কবির কাজ। খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, নয়তো কবিত্ব সুদুর্লভ ব'লে কথিত হবে কেন? বস্তুকে (এবং নিজেকে) নিংড়ে-নিংড়ে কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ নির্যাস বের ক'রে নেয়া—এই শক্তিই কবিত্বশক্তি। বহির্জগতের ঘটনার উপর আমাদের হাত নেই, বস্তু আমাদের প্রজা নয়, কিন্তু আমাদের মন তো আমাদেরই। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু স্ববশ, স্বয়ংসম্পূর্ণ মন একটা আদর্শ মাত্র, যে-আদর্শে অধিকাংশ মানুষই কখনো পৌঁছতে পারে না, আর যাঁরা পারেন তাঁরাও সেই বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসী নন, অতিথি। সে-আতিথ্যে বার বার আহূত হবার অধিকার যিনি অর্জন করেন তাঁকেই আমরা কবি ব'লে থাকি। জনতায় যার জন্ম, কবিচিত্তের অখণ্ড নির্জনতায় তার রূপান্তর যদি ঘটে তাহ'লেই তা কবিতার উৎস হ'তে পারে, নয়তো ইতিহাসে তার আসন যত বৃহৎই হোক কাব্যলোকে স্থান হবে না তার। বিশ্ব অনবরত আঘাতের পর আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, সেই বিশাল বিশৃঙ্খল বৈচিত্র্যকে কবি তাঁর ব্যক্তিগত বেদনায় উপলব্ধি করেন, আবার সেই ব্যক্তিগতকে ফিরিয়ে দেন সার্বভৌম ক'রে। যে-কথা বিশ্বের, তাকে যতক্ষণ একান্ত তাঁর নিজের কথা ব'লে তিনি অনুভব না করেন, ততক্ষণ তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে পারেন না যাতে তা বিশ্বের ব'লে মনে হয়। বিশ্ব যা বলে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিভিন্ন রূপ, কখনো আশাবহ কখনো শোচনীয়, কিন্তু কবির পক্ষে তার সমান মূল্য—যা-কিছু ঘটে, যা-কিছু আছে, সবই তাঁর উপকরণ, এমন-কিছু হ'তে পারে না, যার

বস্তুপিণ্ড থেকে আপন মনের মধ্যে স্থর বের ক'রে নিতে তিনি না পারেন। কবি তাই অকলুষেয়, অনাক্রমণীয়, বহির্জগতের আঘাত পীড়া দিতে পারে শুধু তাকে, যে-মানুষের মধ্যে কবির বাসা, কিন্তু কবিকে কিছুই করতে পারে না। যদি কখনো মনে হয় যে কবিতার উৎস আসছে শুকিয়ে, তার জন্য ঘটনার ঘনঘটাকে কেন দায়ী করবো—তার কারণ খুঁজতে হবে নিজেরই মধ্যে। যে-কোনো সময়ে, কবিকে জয়ী হ'তে হবে মানুষের উপর, নয়তো কবিতা সম্ভব হবে না। দেহ ধারণ ক'রে কবিত্বের এই পবিত্রতা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য, এ-কথা মেনে নিতে হয় যে স্খলন-পতন ঘটবেই, কিন্তু সেই স্খলন-পতনকে বহির্জগতের দোহাই দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা যেন আমরা না করি। পারি আর না পারি, আদর্শ উঁচু রাখা চাই, লক্ষ্য রাখা চাই ধ্রুবতে। আদর্শ বড়ো হ'লে স্বল্প শক্তি নিয়েও আমরা কিছু ভালো কাজ হয়তো করতে পারবো, কিন্তু আদর্শকেই যদি বিকৃত হ'তে দিই, তাহ'লে শক্তিমানেরও ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দেবে। আজকের দিনের বাংলা সাহিত্যে যে-সব বিবেকবান কবিকর্মী 'কেন লিখতে পারছি না', এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করছেন খবর-কাগজে বা রাজপথে, তাঁদের আমি বলি যে সে-উত্তর খবর-কাগজে নেই, রাজপথে নেই, বিশ্বব্যাপারের কোনোখানেই নেই, আছে তাঁদেরই অন্তরে। 'Fool! Look into thine heart and write.'

১৯৭৫

'কবিতা'র কুড়ি বছর

'কবিতা'র কুড়ি বছর আরম্ভ হ'লো। হওয়া উচিত ছিলো একুশ বছর; কিন্তু—পুরোনো পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে—১৩৫৭ ও ৫৮-তে পত্রিকার প্রকাশ এতই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো যে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কাগজে-কলমে পুরো একটা বছর আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা কুড়ি হোক বা একুশ হোক, কোনো কবিতা-পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিকে আছি, এ-কথা এখন মানতেই হবে। হয়তো অসংগতরকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের পরে আমরা যদি অবসিত হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হ'তো, সাহিত্যের উত্তম ঐতিহ্যের অনুগামী। ক্লান্তি নামেনি তা নয়, অন্ধকার প্রহর আমরা জেনেছি, কিন্তু সেই মুমূর্ষুতা অতিক্রম করার প্রেরণা কখনো হারিয়ে যায়নি, তা যেন এই পত্রিকার প্রবাহের মধ্যেই নিহিত ছিলো, তারই আদেশ পালন ক'রে চলেছি আমরা। হোক পত্রিকা, হোক মানুষ, তার সত্যিকার আয়ুষ্কাল ততক্ষণই, যতক্ষণ নিজেকে সে প্রয়োজনীয় এবং সার্থক ব'লে অনুভব করে। অন্যেরা যা বলে বলুক, নিজেকে সার্থক ব'লে অনুভব করাটাই আসল কথা, তারই নাম জীবন।

এই সার্থকতাবোধ কোথা থেকে আসে? আসে মূল্যবোধ থেকে। কোথায় আমরা মূল্য দিয়ে থাকি, আমাদের সব ক্রিয়াকলাপ তারই উপর নির্ভর করে। 'কবিতা'র মতো পত্রিকা অর্থাগমের উপায় নয়, সর্বসাধারণের সামনে বিপুলভাবে উপস্থিত হবারও পথ নয় এটি· এই কাজের প্রকৃতি অনেকটাই ব্যক্তিগত। এ যদি বেড়ে উঠে থাকে এবং অন্তর্ধানের সম্ভব-পরতার প্রতিবাদ ক'রে থাকে, তার কারণ এর অন্য কোনো আকর্ষণ—মনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে কোনো আকর্ষণ। 'আদর্শ' কথাটা বড্ড কড়া, আঁটোসাঁটো, গম্ভীর, 'কবিতা' বের করার সময়, বা পরবর্তী কালে, আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে। যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয়,—কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান ক'রে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতে না হয় রং-বেরঙের পসরার মধ্যে, অনেক বেশি গলার-জোর-ওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকু মাত্র ইচ্ছে করেছিলাম। 'সসম্মানে' এবং 'সুনির্বাচিত', এই বিশেষণ দুটি লক্ষণীয়: যে-পত্রিকায় কবিতা

আর সাহিত্যের আলোচনা ভিন্ন আর-কিছু থাকে না, এসপ্লানেডের স্টলওলার মতে মূল্য যার অসম্ভবরকম বেশি, সেই পত্রিকা যে-ক'জনই কিনবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই কাব্যকলার প্রকৃত অনুরাগী ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। অতএব এতে প্রকাশিত কবিরা অপাত্রে আত্মনিবেদনের লজ্জা থেকে বাঁচেন, এবং সম্পাদকের পক্ষেও সেটাই সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তির কথা। অর্থাৎ, আমরা কবিতা নামক বিষয়টাকে জরুরি ব'লে মনে করি, মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু এসে যায়—যদিও সেটা কেমন ক'রে ঘ'টে থাকে, 'পুনশ্চ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না-হ'লে—যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র-পরিবেশিত জনগণের কোথায় কোন ক্ষতি হ'তো, সেটা বুঝিয়ে দেবার স্পর্ধা আমরা রাখি না। কিন্তু যেমন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি নিরন্তর কাজ ক'রে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারি না, কিন্তু কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হ'লেই পীড়িত হ'য়ে পড়ি—সভ্যতার উপর কবিতার বা শিল্পকলার প্রভাবও সেই রকম। এই পত্রিকার প্রথম থেকেই, কবিতার এই আদিমূল্য আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে, আলোচনা এবং উদাহরণ দ্বারা, এটাও স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছি যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না।

আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম। একটি সৌভাগ্যময় সমাপতন আমাদের সহায় ছিলো; তিরিশের বছরগুলিতে যে সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন স্বর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ক্রিয়াকলাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদের বাহন এবং প্রচারক-রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ। তারপর এই কুড়ি বছরে আরো অনেক তরুণতর সঙ্গ পেয়েছি, পেরিয়ে গেছি বিতর্ক, সহ্য করেছি বিচ্ছেদ, দেখেছি খ্যাতির উত্থান ও পতন, তুচ্ছ এবং মহৎ পরিণাম। আমাদের প্রথম সহযাত্রীদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ মৃত, কেউ-কেউ মৌন, কেউ বা দূরে স'রে গেছেন। কিন্তু—'কবিতা'র সূচিপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে—তাঁদেরই অনেকের বসন্তের দিনে যেমন আমরা এককালে ফুল তুলেছি, তেমনি তাঁদের হেমন্ত ঋতুর ফল কুড়োতেও আজ আমরা যত্নবান। এই নিরবচ্ছিন্ন সহযোগের জন্য ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং যাঁরা আপাতত মৌন, আমরা তাঁদেরও প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী।

কিন্তু এই কয়েকজন কবি—আজকের দিনে পাঠকমাত্রেই যাঁদের সঙ্গে

অনির্বচনীয় সংবাদ—কিংবা, এটাকে যদি খুব বেশি মনে হয়, রচনার কোনো পরিচিত—তাঁদের বাইরে আরো অসংখ্য লেখকের রচনা আমরা প্রকাশ করেছি—কখনো-কখনো এমন রচনা, যা নিজের মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ, উপরন্তু সম্ভাবনার বাহন। বস্তুত, 'কবিতা'র পৃষ্ঠা থেকে অখ্যাত লেখকদের কবিতা বেছে নিয়ে একটি মনোহর সংকলনগ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয়; কয়েকটি, এমনকি হয়তো একটিমাত্র ভালো কবিতা লিখে অনেকেই এক নিরভিজ্ঞান কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছেন—তারপরে আর তাঁদের বিষয়ে কিছুই শুনিনি বা জানতে পারিনি। কী হ'লো তাঁদের, কেন আর লিখলেন না, কোন দারিদ্র্য অথবা সাফল্য, উচ্চাশা অথবা হতাশার চাপে ঠোঁটের উপর ভাষা ম'রে গেলো তাঁদের, না কি ঐটুকুর বেশি বরাদ্দ নিয়েই জন্মাননি তাঁরা—এই সব দূরকল্পনা বিজ্ঞানীর প্রদেশভুক্ত, সাহিত্যিকের নয়। কিন্তু এই ঐকাহিক লেখকদের—যাঁরা অন্তত একবারও ডাক শুনতে পেয়েছিলেন—তাঁদেরও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি: যুগে-যুগে এই ক্ষণকালীনের যে-স্রোত ব'য়ে চলে সমসাময়িকের সংলগ্নতায় তার প্রয়োজন আছে, এবং পরিশ্রমী ও বিবেকবান উত্তরকালের ভাণ্ডারে যে এ থেকে দু-একটি রত্ন চয়িত হ'তে না পারে তাও নয়। সার্থকতা গভীরতম অর্থে দৈবাধীন; আমাদের কাজ প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি রাখা।

নতুন কবিরও অনটন ঘটেনি। সাহিত্যিক হিশেবে কুড়ি বছরের মধ্যে দুই বা তিন পুরুষ বেড়ে উঠতে পারে; আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান—তাঁদের, এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি। আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি কয়েকজন তরুণ কবির যাথার্থ্য—হয়তো তাঁরাও আক্ষরিক অর্থে আর তরুণ নন, কিন্তু কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে তাদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সন্থগর্ভিণীর অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে তরুণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে পেরেছে, তার অনেকগুলো আবার একেবারে প্রথম বই। এ-সব বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ধারণা হয় যে বাংলা কবিতার পরবর্তী যুগান্তর এখনো কালের গর্ভে নিহিত। এটা নিরাশার কথা নয়, কেননা সৃষ্টিমাত্রেই সময়-সাপেক্ষ, বিশেষত শিল্পকলার বিবর্তনে কালের দুর্জ্ঞেয় প্রভাব অমোঘভাবে কাজ ক'রে থাকে। আপাতত কোনো-কোনো নতুন কবি কলাকৌশলে নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন, বৈচিত্র্যেরও আস্বাদ পাই মাঝে-মাঝে, বিরল কোনো মুহূর্তে একটি সুন্দর, উদ্ধৃতিযোগ্য কবিতা। যেটা পাওয়া যায় না সেটা কোনো স্পর্শসহ বস্তু, পাওয়া যায় না পংক্তির ফাঁকে-ফাঁকে না-বলা এবং

অনুরণন পাওয়া যায় না। এই গুণটা কবির চিত্তবৃত্তিরই নিঃসার, কিন্তু কার মধ্যে তার সম্ভাবনা আছে বা নেই তা প্রাথমিক অবস্থায় বলা যায় না; এবং শিক্ষা, সংযম ও ভাবনার দ্বারা যা উপার্জনীয় তার সবটুকু উপার্জন ক'রে নিতে যিনি পণ করবেন, শুধু তাঁরই অধিকার জন্মাবে অনুপার্জিত, প্রদত্ত অমৃতে।

১৯৫৫

